জঙ্গল পাহাড়ী

পরেশ ভট্টাচার্য্য

শঙ্কর প্রকাশন ॥ ১৫/১এ যুগলকিশোর দাস লেন ॥ কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : বড়দিন ১৯৬০

শঙ্কর প্রকাশন, ১৫/১এ যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে নিতাই মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ঝর্ণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬৩/এ তারক প্রামানিক রোড, কলিকাতা ৬ হইতে সুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

ব্লক ও কভার মুদ্রণ—প্রেস এণ্ড প্রসেস স্টুডিও কলি-৯ প্রচ্ছদ—ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়

এই কাহিনীর পটভূমি পশ্চিমবাংলার অরণ্য অঞ্চল সুন্দরবন এবং বিহার সীমান্তের মেদিনীপুর জেলার চিলকিগড এলাকাব বনভূমি।

সুন্দরবনের রূপ যেমন ভয়ংকর, তেমন সুন্দর। অজস্র নদী নালা সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে মাকড়সাব জালের মতো। সুন্দরবন এলাকাব মাটি যতই সিক্ত হোক, অরণ্য যতই সবুজ হোক—ভয়ংকর সরীসৃপ, হিংস্র শ্বাপদের অবাধ রাজত্ব এই এলাকার জলে-জঙ্গলে। সেখানকাব আবাদ এলাকার মানুষ একদিকে দুর্বার-দুরন্ত, অন্যদিকে শান্ত-সুন্দর। সংগ্রাম আব শান্তি সেখানকার জন-জীবনেব মূল কথা।

চিলকিগড এলাকাব বনভূমিব রূপটা অন্য-রকম। সেখানকাব ছোট্ট নদী ডুলং আর শাল, মহুয়া, পিয়াশালেব অবণ্যেব মধ্যে বয়েছে আশ্চর্য এক যাদুকবী মায়া। তারই মধ্যে সেখানকার মানুষের হাসি কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহেব পালা চলেছে।

সুন্দরবনের গেঁয়ো, গরান, ওড়া, পিটুলি, ক্যাওড়া এক রসধারায় পুষ্ট, চিলকিগড়েব শাল, মহুয়া, পলাশ, পিয়াশাল অন্য বসধাবায় পুষ্ট। কিন্তু দুইয়েরই শিকড় মাটিতে এবং বসপিপাসু দুয়েরই পাতা সূর্য-সন্ধানী।

সুন্দরবনের আবাদ এলাকাব মানুষের সঙ্গে চিলকিগড়ের বন-অঞ্চলের জীবনধারায় যতই অমিল থাক, তবু তারই মধ্যে রয়েছে আশ্চর্য রকমের মিল।

সুন্দরবনের দুরন্ত রায়মঙ্গলের মতো, চিলকিগড়ের ক্ষীণকায়া ডুলুংও সাগরসন্ধানী।

এই লেখকের

মাঝি

অমানুষ

মানসগঙ্গার পথে

রঙমহল

নাম তার রূপসী

দুর্গম-সুন্দর

ওস্তাদ

—হ্যারে দ্বিজু দিক ভুল হয়নি তো ?

খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল দ্বিজু, জঙ্গলের কথাটা তার কানে যায়নি। তা ছাড়া গা-ঘোর অন্ধকারে বন-বাদাড় ভাঙতে ভয়ে-ভয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

জঙ্গল এবারে ফিরে দাঁড়ায়, একটু জোর গলাতেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় দ্বিজুর কানে।

দ্বিজু জবাব দিতে পারে না। এদিক-ওদিক তাকায়। অন্ধকারে চোখের নজরই হোঁচট খেয়ে ফিরে আসে, তা দিকের হিসেব করবে কি করে।

—কি রে বোবা হলি নাকি ?

এবারে দ্বিজু বলে কোন দিক থেকে আসতিছি, কোন দিকে যাচ্ছি, আমি কিছু বুঝতি পারতিছি নে।

জঙ্গল বলে, সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে দুটি মানুষ এদিক-ওদিক ফিরে তাকায়, কিন্তু ঝোপ-জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না।

অথচ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মনে মনে দিক হিসেব করেই ওরা দক্ষিণে পা বাড়িয়েছিল। দক্ষিণেই খাড়ির মুখে বাঁধা আছে ডিঙিটা।

যত সময় পশ্চিম-আকাশে রঙ ছিল তত সময় হিসেবটা ঠিকই ছিল। সন্ধ্যে উতরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাউণ্ডুলে মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়তে অন্ধকার ঘন হয়ে আসে, তারপর সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। নিশ্চয়ই দিক ভুল হয়েছে, নয়তো খাড়ির মুখে পৌঁছতে তো এত সময় লাগবার কথা নয়। যত সময় হাঁটছে এর মধ্যে গোটা চরটাই চক্কোর দিয়ে আসা যায়। আর এত সময় হেঁটেও খাড়ির মুখে পৌঁছতে পারলো না।

পকেট থেকে দুটি বিড়ি বার করে একটি নিজে নিলে, আর একটি দ্বিজুকে দিলে জঙ্গল। ফস করে দেশলাই-এর কাঠি জ্বালতেই চোখের সামনের অন্ধকারটা যেন চমকে উঠলো।

বিড়িতে বার কয়েক টান দিয়ে কি মনে করে সোজাসুজি না গিয়ে বাঁ দিকে পা চালালো। ছায়া-অনুচরের মতো দ্বিজু তাকে অনুসরণ করলো।

পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা থেকেও নেই। জলছে না। ডুমটা কেটে গেছে। বার বার ঝাঁকুনি দিয়েও টর্চটা জলেনি, কাঁচ খুলে ডুমটা নাড়া-চাড়া করেও দেখেছে। টর্চটা জললে এই ঝুট-ঝামেলায় পড়তে হতো না।

কোথাও কিছু নয়, একটা কুল্লো পাখি আচমকা বিদঘুটে স্বরে ডেকে উঠলো। ভয়ে হুড় মুড় করে জঙ্গলের গায়ের ওপর এসে পড়ল দ্বিজু।

খিঁচিয়ে উঠলো জঙ্গল, করিস কি—তুই কি কোলের ছেলে নাকি?

দ্বিজু কথা বলে না। ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায়।

একটা বিড়িতে নেশা মেটেনি জঙ্গলের। বিড়ির আগুনে আরএকটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করে।

তারকদার চর। আগাছা আর ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু নেই দুঃসাহসী মানুষ ছাড়া এ চরে বড় কেউ আসে না। নানা জাতের সাপের উৎপাত এখানে। চরের চারদিকে রায়মঙ্গল জড়িয়ে আছে, আর চরের মাঝ বরাবর একটা সরু খাড়ি এদিক-ওদিক হাত-পা ছড়িয়ে রয়েছে, যেখানে মেছো-কুমিরের আড্ডা। ওই খাড়ির দক্ষিণ মুখে বাঁধা জঙ্গলের ডিঙি।

এ চরে মাঝে মাঝে বনো খরগোশের সন্ধানে আসে জঙ্গল। আজও এসেছিল। তাছাড়া বালি হাঁস আর পানকৌড়ির ওপরেও ঝোঁক ছিল। সেই সাত সকালে গাদা-বন্দুক কাঁধে নিয়ে স্যাঙাত দ্বিজুর সঙ্গে জোয়ারের জলে ডিঙি ভাসিয়েছে, তারপর সারাদিন চর ঠেঙিয়ে ফিরছে এখন। সারাদিন চর চুঁড়ে বেরিয়ে একটির বেশী দুটি খরগোশ মেলেনি। একজোড়া কাঁক পাখী পেয়েছে বটে, তা-ও ঠিক মনের মতো নয়। মেজাজটা তাই বিগড়ে আছে জঙ্গলের।

একটা ভয়ংকরের মতো অন্ধকারে বন-বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে জঙ্গল। কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে পা, পরনের কাপড় ফড় ফড় করে ছিঁড়ে যাচ্ছে —তবু কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। এক ভাবে হেঁটে চলেছে। পরনে মাল-কোঁচা-মারা কাপড়, গায়ে খাকির হাফশার্ট। ডান কাঁধে গাদা বন্দুকটা মস উঁচিয়ে রয়েছে, বাঁ কাঁধে ঝুলছে মরা খরগোশ। খরগোশের গলার কাছটা গুলি লেগে ফুটো হয়ে গেছে, এখনো সে জায়গাটা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরে পড়ছে—যে রক্ত জঙ্গলের জামা-কাপড়ে মাখামাখি। মরা কাঁক পাখি দুটো লতা দিয়ে বাঁধা খরগোশের ঠ্যাঙের সঙ্গে।

তা ছাড়া ধেনো মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে জঙ্গল। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। সারাদিন রোদে পুড়ে মুখটা যেন তামাটে হয়ে গেছে। মাথার বাবরি চুলগুলো কপাল ডিঙিয়ে চোখের ওপর এসে পড়েছে।

জঙ্গল কতো সহজে বন-বাদাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে। ভয় কি তা ওর জানা নেই। কিন্তু দ্বিজুর বুকটা ছম ছম করছে, তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। বললে, এমনি ধমকে উঠবে জঙ্গল, কিংবা হয়তো থাপ্পড় লাগিয়ে দেবে। মানুষটাকে তো সে জানে, মেজাজ একটুতে চড়ে ওঠে।

—হ্যাঁরে দ্বিজু, কিছু শুনতে পাচ্ছিস?

দ্বিজু কান খাড়া করেও কিছু শুনতে পায় না। বলে, কই কিছু তো শুনতি পাচ্ছি নে।

—ভাঁটার টান লেগেছে গাঙে, খাড়ির মুখ দে জল বেরোচ্ছে।

তবুও দ্বিজুর কানে জলের শব্দ পৌঁছয় না। বরং ভয়ে ভয়ে ভাবে দুষ্টু নিশি তাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না তো!

কিন্তু আরো কিছু দূর এগোতেই জলের শব্দটা স্পষ্ট হলো। জঙ্গল আরো দ্রুত পা চালালো। দ্বিজু সমান তালে পা চালাতে গিয়ে লতায় পা জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে সেই আগাছার ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে ছুটতে আরম্ভ করে।

অবশেষে ওরা গাঙ ধারে খাড়ির মুখে পৌছলো। খাড়ির মুখে গুড়চাকা গাছের আলগা শিকড়ে ডিঙিটা বাঁধা রয়েছে। ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে নীচে, নরম পলি-কাদার ওপর ডিঙিটা কাত হয়েছে। ডোরায় জলের কলসী আর হ্যারিকেন মুখ থুবড়ে আছে। কলসীতে জল নেই। হ্যারিকেনের তেলও খানিক পড়ে গেছে।

কাছি খুলে জঙ্গল দু'হাতে ঠেলে ডিঙি জলে ভাসালো। পায়ের কাদা ধুয়ে ডিঙির মাথায় জুৎ করে বসে প্রথমেই একটা বিড়ি ধরায়। আর দ্বিজু বসলো হালের মুঠি ধরে। ভাঁটার টানে ডিঙি ভেসে চললো দক্ষিণে।

দুজনেরই তেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু এতটুকু জল নেই কলসীতে। অথচ রায়মঙ্গলে কতো জল। কিন্তু মুখে দেবার উপায় নেই। নোনা জল, মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত-মুখ সিঁটিয়ে যায়। পেটে গেলে আর রক্ষে নেই, নাড়ি ভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে বমির টানে।

সামনেই রমাপুর। হাটখোলায় একটা টিউবওয়েল আছে। রমাপুর

না পৌঁছনো পর্যন্ত চেষ্টা নিয়ে থাকতে হবে। তবে গাঙে যে রকম টান, তাতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রমাপুরের হাটখোলার ঘাটে পৌঁছে যাবে।

রমাপুরের হাটখোলার ঘাটে পৌঁছে দুটো মাটির কলসী আর হ্যারিকেন হাতে নিয়ে জঙ্গল নেমে গেল। এ তল্লাটের ভেড়ি পথ তার নখ দর্পণে, অন্ধকারের মধ্যেও ঠিক পৌঁছে যাবে হাটখোলায়।

হাটখোলায় পৌঁছে তবে কিছুটা স্বস্তি—

হাটখোলার দোকান থেকে কেরোসিন ভরে নিলে হ্যারিকেনে। তারপর দু'কলসী জল ভরে ফিরে এলো ডিঙিতে।

দ্বিজু বলে, রান্নাবাড়া করতে হবে তো?

জঙ্গল বলে, না হলে খাবি কি? পোড়া পেটে তো কিছু দিতে হবে। যম কথা শোনে, কিন্তু পেট কথা শোনে না। তুই যা হোক দুটো এক পাকে ফুটিয়ে নে। মুসুরির ডাইল আছে টিনের কৌটোয়, তাই ন্যাকড়ায় বেঁধে দুটো ভাতে দে। প্যাঁজ, কাঁচা লঙ্কা দে খেতে মন্দ লাগবে না। শেষটা না হয় দুটো প্যাজ পোড়ায়ে নিস?

দ্বিজু ডোরায় যায়। ছই-এর কোণেই হাঁড়ি-পাতিল যা কিছু। শুকনো কাঠও রয়েছে একটা ক্যানেস্তারার মধ্যে।

ডোরার দু'ঝিঁকের উনুন-জেলে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দেয় দ্বিজু। আর জঙ্গল হাল ধরে বসে থাকে ডিঙির মাথায়। মরা খরগোশটা চোখের সামনে হাত পা ছড়িয়ে রয়েছে। গুলি লাগা জায়গাটায় লাল-রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে রয়েছে। আর কাঁক পাখি দুটো পড়ে রয়েছে একান্তে।

ক্ষিধেয় পেটের নাড়ি চোঁ চোঁ করছে জঙ্গলের। সেই কোন সকালে পান্তা খাওয়া, তারপর দুপুরে শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে খানিক জল খাওয়া—ক্ষিধের আর দোষ কি। তারপর সকালে খানিকটা ধেনো মদ গিলে বেরিয়েছিল, চরে নামার আগে আরো পুরো এক পাঁইট মদ গলার মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল—তারও একটা টান আছে। সব মিলিয়ে পেটের মধ্যে ক্ষুধা-রাক্ষসটা যেন হাঁ করে আছে।

গাঙে এখন ভাঁটার টান। এই টানেই ডিঙি ছাড়লো জঙ্গল। দাঁড় টানার ঝামেলা নেই, শুধু হাল ধরে বসে থাকা।

জঙ্গল নিজেই হালের মুঠি ধরে বসলো। মাঝদরিয়া বরাবর ডিঙি চললো উত্তর থেকে দক্ষিণে।

দ্বিজু ডোঙায় বসে আপন মনে উনুনে কাঠের টুকরো গুঁজে দিচ্ছে। কাঠগুলোও কেমন স্যাঁত-সেঁতিয়ে উঠেছে, ঠিক মতো জ্বলছে না। বারে বারে চোঙা দিয়ে ফুঁ দিতে হচ্ছে।

কি মনে হয় জঙ্গলের, হঠাৎ বলে ওঠে, তোরে এখনো মানুষ করতি পারলাম না দ্বিজু।

কথা কানে নিয়েও চুপ করে থাকে দ্বিজু।

—এ্যাই দ্বিজু, শুনতে পাসনি আমার কথা ?

এবারে দ্বিজু ফিরে তাকায়। কিন্তু কথা বলে না। সে তো জানে জঙ্গলকে, তিন বছর দেখছে—কথা মনের মতো না হলেই ফোঁস করে উঠবে। আর কোন কথা যে তার মনের মতন হবে তা ভগবানও জানে না।

জঙ্গল বলে, দুটো কাঁক পাখী রয়েছে, তার একটা ছাড়িয়ে-ছুড়িয়ে নে না। নুন-প্যাজ দে কোটায়ে নিলে খারাপ লাগবে না। মাল খাবার পর একটু মাংস না হলে চলে ?

দ্বিজুও মনে মনে ভাবছিল কাঁকপাখীর কথা, কিন্তু ভয়ে বলেনি। জঙ্গলের কথা শুনেই সে ডোঙার বাইরে আসে, বড় কাঁকপাখীটাকেই তুলে নেয়।

জঙ্গল বলে, এই তো বোকাচন্দরের বেশ বুদ্ধি খুলেছে।

যদিও এ ধরনের উল্টোপালটা কথা শুনলে দ্বিজুর মনটা খারাপ হয়, তবু সে নীরবেই সহ্য করে। ভালো মন্দ যাই হোক, এই মানুষটার কাছ থেকেই সে ভালোবাসা পেয়েছে। নয়তো সর্দারপাড়ার সবাই তো 'রাঁড়ের বেটা' বলে তার গায়ে থুতু দিয়েছে। যেদিন থেকে জঙ্গল তাকে কোল দিয়েছে, সেদিন থেকে সর্দারপাড়ার লোকের মুখ বন্ধ হয়েছে। জঙ্গল নিজেই বলে, আমার মুখের কথাই হলো আইন। আমার কথা যে না শোনবে তারে পস্তাতে হবে।

দ্বিজু জানে, জঙ্গলের বাইরেটা যেমনই হোক, তার মধ্যে মানুষের মন আছে। আর সেই মনের পরশ সে পেয়েছে।

সেদিনের কথা দ্বিজু ভোলেনি—ওর মা নিমি দাসী জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মরলো। গাঁয়ের লোক বললে, থানা পুলিশ করার কথা। পুলিশ না এলে ওই লাশ কেউ নামাবে না। তা ছাড়া এমন কথাও উঠলো, 'পেরাচিত্তির' না করা পর্যন্ত ও মড়া ছোঁয়াও পাপ।

রায়মঙ্গলের ধারে সরকারি ভেড়ির ধারে নিমি দাসীর দোচালা।

দোচালার সামনে ভিড়। আর দোচালার 'হাত্নেয়' বসে একটা বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে হাউ হাউ করে কাঁদছে.।

জঙ্গল সেদিন সর্দার পাড়ায় এসেছিল একটা কাজে। দূর থেকে ভেড়ির ধারে কুঁড়ে ঘরের সামনে ভিড় লক্ষ্য করে সে সেখানে এসে হাজির হয়। জঙ্গল তো এ তল্লাটের কারো অচেনা নয়—সবাই জানে মানুষটার কথা। যে না-দেখেছে সে-ও নাম জানে।

জঙ্গল এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করা মানুষগুলোর বাজে কথা কপচানো বন্ধ হয়ে যায়। আর জঙ্গলও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে সোজা দোচালার দিকে এগিয়ে যায়।

—এই ছোঁড়া কি হয়েছে রে?

দ্বিজু ফিরে তাকায় অর্জ্জুনের মুখের দিকে।

—এটা নিমির বাড়ি না? জঙ্গল জানতে চায়, কিহয়েছে, তোর মা কোথায়?

দ্বিজু উচ্চ-কান্নায় ফেটে পড়ে। কান্নার মধ্যে আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয় ঘরের দিকে।

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই জঙ্গল শিউরে ওঠে। নিমির দেহটা ঝুলছে ঘরের আড়ায়।

এবারে দ্বিজু পা জড়িয়ে ধরে জঙ্গলের, বলে যায় তার কথা। ক্ষেপে ওঠে জঙ্গল। দাওয়া থেকে উঠোনে লাফিয়ে পড়ে বলে, হ্যা, একটা মেয়ে মানুষ গলায় দড়ি দে মরেছে তার জন্যে আবার থানা পুলিশ। আমি বলতিছি, নামাও লাশ—শ্মশানে না পোড়াতি পারো বালিঘাট করে দাও গে। ওর যখন বয়েস কাল ছিল. তখন তো পাড়ার ঘুঘু-রা লুটে পুটে খেয়েছো ওই দেহটা, এখন মরেছে কামোট কুমিরে খাক গে।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলে ওঠে, কিন্তু আইন বলে একটা কথা আছে তো?

—তুত্তোর নিকুচি করেছে আইনের। জঙ্গল বলে, লাথি মারি আইনের মাথায়—আমার মুখের কথাই আইন। যাও, নামাও লাশ।

ভিড় করা মানুষগুলো এর-ওর মুখের দিকে ফিরে চায়। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না। এর পর কথা বললে এখুনি ক্ষেপে যাবে জঙ্গল। ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই—একেবারে বুনো মোষের সামিল।

সেই গলায় দড়ি দেয়া লাশ নামিয়ে তবে শান্ত হয়েছিল জঙ্গল। ভিড়

করা মানুষগুলোর মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে মুখে 'রা' কাড়ে। সব মান-অপমান বেমালুম হজম করে সর্দারপাড়ার মাতব্বরেরা সেদিন নিমির লাশ নিয়ে গিয়েছিল শ্মশানে।

এই ঘটনার বছর চারেক বাদে পারঘুমটির হাটে জঙ্গলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল দ্বিজুর। জঙ্গল চিনতে পেরেছিল দ্বিজুকে। বলেছিল, কি রে—ভালো আছিস তো? করিস কি?

দ্বিজু বলেছিল, হিঙ্গলগঞ্জের হাটখোলার একটা দোকানে কাজ করছি—তবে মনিব যা খিট্‌খটে জানি নে কদ্দিন কাজ করতি পারবো।

কি মনে হয়েছিল জঙ্গলের, বলেছিল, ও সব ছেড়েছুড়ে দে চলে আয় আমার কাছে। পারবি তো বাদায় যাতি? বাদায় গোলপাতা কাটতি হবে, মরশুম এলে মৌ ভাঙতি হবে। আর এ সব কাজ পারবি তো মন গেলেই আমার কাছে চলে আসবি।

এরও বছর দুই বাদে দ্বিজু একদিন নিজে থেকেই জঙ্গলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিজু তখন পুরো জোয়ান।

প্রায় তিন বছর হলো দ্বিজু আছে জঙ্গলের কাছেই। এই তিন বছরে নোনা গাঙ আর বাদা বনের 'চরিত্তির' বুঝেছে দ্বিজু, কিন্তু জঙ্গল পাহাড়ীরে বুঝতে পারেনি। মানুষটা যেন ওই এক রকম। আরো দশটা মানুষের সঙ্গে তার অনেক ফারাক।

—এ্যাই দ্বিজু, কি ভাবিসরে?

ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে কাঁক পাখিটাকে টুকরো টুকরো করে কড়ায় চাপিয়েছে দ্বিজু। পেঁয়াজ আর মাংসের একটা চামসা গন্ধ উঠছে। মাংসটা খুন্তি দিয়ে নাড়তে নাড়তে দ্বিজু জবাব দেয়, আমার কথাই ভাবতিছিলাম।

—তোর কথা?

—হ্যাঁ, তুমি যদি না থাকতে আমার অবস্থা কি হতো বলো দিকিনি।

—কি আবার হবে? জঙ্গল বলে, ওরে ছোঁড়া আমি পীর পয়গম্বর না, আমি একটা মানুষ, রক্ত মাংস দে তৈরী—তার বেশী কিছু না।

দ্বিজু চুপ করে যায়। জঙ্গল কিছু সময় চুপ করে থেকে পারের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় এ্যালাম বলতি পারিস?

ছই-এর বাইরে মুখ বার করে পারের দিকে নজর দেয় দ্বিজু। বলে, তিল পাড়ার কাছে এ্যালাম বোধহয়।

জঙ্গল বলে, তা যদি হয় তা হলি এই ভাঁটায় আমরা সর্দারপাড়ার ঘাটে

পৌঁছে যাবানে। কি বলিস? তবে আকাশের যা অবস্থা, শেষটা ঝড়-বাতাস না ওঠে। আর গরমও পড়েছে তেমনি।

ঝড়ের কথায় দ্বিজুর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। ঝড় উঠলে রায়মঙ্গলের চেহারাই বদলে যায়। তবুও ভরসা রাখে জঙ্গলের ওপর। যার হাতে হাল থাকলে ঝড়-তুফানও হার মানে।

ছই-এর ভিতর থেকে দ্বিজু লক্ষ্য করলো জঙ্গল এক ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর জঙ্গল একটা বিড়ি ধরিয়ে ছই-এর বাইরে বাঁশের চালার ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। দ্বিজুকে বললে হালের মুঠি ধরতে। হাল ধরা যেমন তেমন, ডিঙি মাঝ দরিয়া বরাবর নিজে থেকেই ভেসে চলেছে ভাটার টানে।

শুয়ে থাকতে একটু যেন আবিলির মতো এসেছিল জঙ্গলের। আচমকা একটা আর্ত কণ্ঠস্বর গাঙের বুক থেকে ভেসে এলো। ঘুমের ভাবটা টুটে গেল জঙ্গলের। উঠে বসলো। এখন আর একটি আর্ত কণ্ঠস্বর নয়—নানা কণ্ঠের কলরব ভেসে এলো। নানা কণ্ঠের মধ্যে একটি নারী কণ্ঠের কান্নার আওয়াজও যেন মিশে রয়েছে।

কোন দিক থেকে আওয়াজটা আসছে প্রথমটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না জঙ্গল। গাঙ-দেশে এ রকমটা হয়। তবু শেষ পর্যন্ত জঙ্গল মনে মনে হিসেব করে নিলে দক্ষিণ-পশ্চিমে গাঙের ওপর থেকেই চীৎকারটা ভেসে আসছে।

আর কোনো চিন্তা-ভাবনা নয়, দ্বিজুকে দাঁড় টানতে বলে নিজে হালের মুঠি ধরে ডিঙির মাথায় দাঁড়ালো জঙ্গল।

একে ভাঁটার টান, তারপর দ্বিজুর সবল হাতে দাঁড় টানা—তীরের বেগে ডিঙি চললো গাঙের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে।

এতক্ষণে আওয়াজটা আরো স্পষ্ট হয়ে কানে আসছে, নারী কণ্ঠের কান্নার সুরটাও স্পষ্ট। জঙ্গলের অনুমান, নিশ্চয়ই গাঙের বুকে অঘটন কিছু ঘটছে। জঙ্গল সেই মুহূর্তে একবার উচ্চকণ্ঠে 'হাঁকার' দেয়।

কোনো কিছু বিপদ আপদের গন্ধ পেলে জঙ্গলের নাকের ডগাটা অদ্ভুত ভাবে স্ফীত হয়ে ওঠে, আর কাঁপতে থাকে। তাছাড়া ওর রক্তও চন্‌মন্ করে ওঠে, ভাঁটার মতো জ্বলতে থাকে চোখ দুটো।

কিছুদূর এগোতেই চোখ ধাঁধানো টর্চের আলো এসে পড়লো জঙ্গলের চোখে মুখে। তারপর টর্চের আলোটা ঘুরে গিয়ে পূবের পাড়ে পড়লো। জঙ্গল বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়লো। হুঙ্কারের মধ্যে কোনো ভাষা নেই, শুধু ভয়ঙ্কর কণ্ঠের একটা চীৎকার।

জঙ্গল লক্ষ্য করলো একটা হালকা ডিঙি তীরের বেগে তার ডিঙির পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। পাশ কাটিয়ে যাবার মুহূর্তে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে দিলে। ছুটন্ত ডিঙিটা হুড়মুড় করে এসে পড়লো তার ডিঙির ওপর। আর সেই মুহূর্তে জঙ্গল লাফিয়ে পড়লো সেই হালকা ডিঙির ওপর। টালমাটাল করে উঠলো ডিঙি। জঙ্গল যে মানুষটাকে সামনে পেল তাকে দু'হাতে ধরে ফেলে দিল নোনা গাঙের জলে। আর গর্জে উঠলো তার ভয়ংকর কণ্ঠ—কার ডিঙি—

বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও বুদ্ধি হারায় না জঙ্গল। সে জানে, বাধা আসবেই। কিন্তু বাধা আসার আগেই ডিঙির মাথায় দাঁড়িয়ে দুদিকের মলমে পা দিয়ে হালকা ডিঙিটা অদ্ভুত ভাবে দোলাতে লাগলো। হালকা ডিঙি—সহ্য করতে পারবে কেন, একদিকে কাত হয়ে গেল। আর যে মানুষটি দাঁড়ে বসে ছিল, সে নিজের ডিঙি ছেড়ে জঙ্গলের ডিঙিতে লাফিয়ে পড়লো। সেই মুহূর্তে জঙ্গলও নিজের ডিঙিতে উঠে এসে গাদা বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলে।

চোখ ধাঁধানো টর্চের আলোটা পড়লো জঙ্গলের মুখে। একটা ভয়ংকরের মতো গাদা বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে, জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে ডিঙির মাথায়। চীৎকার করে বলে, চিনতে পেরেছিস আমাকে?

একটা ভয়-চাপা কণ্ঠ কানে আসে জঙ্গলের।—ওরে বাপরে, জঙ্গল পাহাড়ী।

জঙ্গলও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির ওপর।

অন্ধকারের মধ্যেও মানুষটাকে চিনতে পারে। জীবন ঢালি। এ তল্লাটের জ্যান্ত শয়তান। যার পেশা ডাকাতি।

—এ্যাই জীবনে, কার সর্বনাশ করলি?

জীবনের সাকরেদই হবে, পিছন থেকে একটা কোঁচ বাগিয়ে এগিয়ে আসতে চায়। জঙ্গল সজোরে জীবনের গলা চেপে ধরে ওর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাখে। যে লোকটা কোঁচ বাগিয়ে ধরেছে, জঙ্গলকে আক্রমণ করার পথ সে খুঁজে পায় না। এর মধ্যে খিজু ডিঙির 'চলা' তুলে পিছনের লোকটিকে পিছন

থেকে এন্তার ঠেঙাতে আরম্ভ করে। লোকটা কোঁচ ফেলে গাঙের জলে লাফিয়ে পড়ে।

জীবন ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, আমারে ছেড়ে দ্যাও, নয়তো—

—নয়তো আবার কি ? জঙ্গল এবারে সজোরে চেপে ধরে জীবনের গলা। বলে, যার নামে বনের বাঘ পালায়, তুই এইছিস তার সঙ্গে মস্‌করা করতি। হারামজাদা কোথাকার—হাত পা বেঁধে তোরে গাঙের জলে ফেলে দেবানে। ভালো চাস তো এখনো বল কার সর্বনাশ করিছিস ?

জীবনও ছাড়ার পাত্র নয়, সাতজেলে-রাঙাবেলে অঞ্চলের ডাকসাইটে ঠ্যাঙাড়ে সে, রাত-বিরাতে নৌকায় ডাকাতি করাই তার পেশা ·খুন-জঙ্গলেও কমতি যায় না। বে-কায়দায় পড়েও সে ফন্দি আঁটছে কি করে জঙ্গলের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। খানিক সময় ভালোমানুষের মতো চুপচাপ থেকে আচমকা এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নেয়। মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা হয়েও জঙ্গল ভুল করে না। জীবন জলে ঝাঁপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ডিঙির পাটাতন থেকে বাঁশের 'চলা' তুলে সজোরে আঘাত করতে যায় জীবনের মাথায়। চতুর জীবন আগেই ডুব দেয়। জঙ্গল জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে মনে করেও ঝাঁপ দেয় না।

গাঙের বুকে অন্ধকার তেমন নয়, জঙ্গল লক্ষ্য করে ডুব-সাঁতার কেটে জীবন কিছু দূর সরে গিয়ে মাথা তুলছে। এবারে জঙ্গল সেদিকেই ডিঙি নিয়ে চলে। ইতিমধ্যে জীবনও মাথা তুলে 'আওয়াজ' দিয়েছে। এ আওয়াজের ব্যাপারটা জঙ্গলের অজানা নয়—যখনই ওরা ডিঙিতে ডাকাতি করে, তখনই গাঙ-পায়ে ওদের দলের কিছু লোকজন অপেক্ষা করে, বিপদ বুঝলে তারা ছুটে আসে।

জীবনকে পাকড়াও করে জঙ্গল। দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে জীবনকে ডিঙিতে তুলে জঙ্গল ক্ষ্যাপা বাঘের মতো গর্জন করে ওঠে। জীবনও রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু জঙ্গলের এক ঘুঁসিতে সে বেসামলে হয়ে পড়ে। চাপা গর্জন করে জঙ্গল বলে, তোর বিষদাঁত আমি ভেঙে দেবো—শয়তানের বাচ্চা কোথাকার। ভালো চাসতো দাঁড় টেনে চল—দেখি কার সর্বনাশ করিছিস।

জীবন একেবারে কেঁচো হয়ে যায়। জঙ্গলের ডিঙির দাঁড়ে গিয়ে বসে। আর জঙ্গল তখন গাদা বন্দুকের নলটা জীবনের বুকের ওপর বাগিয়ে ধরে রেখেছে।

এর মধ্যে জঙ্গল চারদিকে নজর রেখেছে। সে জানে, জীবনের দলের আরো লোকজন নিশ্চয়ই কাছে পিঠে ডিঙি নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু এদিক ওদিক দেখেও তেমন কিছু চোখে পড়লো না।

জীবন দাঁড় টানছে। ঝিন্টু বসে আছে হাল ধরে। নারী কণ্ঠের কান্নার সুরটা এখনো আসছে। অদূরেই একটা ডিঙি চোখে পড়লো জঙ্গলের। চীৎকার করে জঙ্গল বলে, কার ডিঙি, ইদিকে এসো।

নারী কণ্ঠের কান্নার সুরটা আবার উচ্চ গ্রামে পৌঁছলো। নিশ্চয়ই আবার কোনো বিপদের কথা ভেবে ভয় পেয়ে থাকবে।

জঙ্গল এবারে চীৎকার করে জানিয়ে দেয়, ভয় নেই--আমি জঙ্গল পাহাড়ী।

পুঁইজালির শঙ্খ সামন্ত ছেলের বৌকে নিয়ে ফিরছিল তুলখলি থেকে। লঞ্চ ধরতে পারেনি, তাই ডিঙিতে চেপে যাওয়া। ছেলের বৌ বারবার বলেছিল, এই রাতের বেলায় ডিঙিতে যাওয়া ঠিক হবে না বাবা।

ধর্মভীরু মানুষ শঙ্খ সামন্ত। বলেছিল, আমি তো কারো পাকা ধানে মই দেই নি, কারো কোনো ক্ষতি করিনি--আমারে কেউ কিছু করবে না। তা ছাড়া মাস্টার বলে সবাই মান্য করে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপদ শঙ্খ সামন্তের অপেক্ষায় ছিল। তিলপাড়ার কাছাকাছি আসতেই গাঙ-পার থেকে টর্চের আলো এসে পড়ে ডিঙির ওপর। পরক্ষণে শুনতে পায় দাঁড় টানার শব্দ। দেখতে পায় একটা ডিঙি ছপাছপ দাঁড় টেনে এদিকেই আসছে। কিন্তু তখনো বুঝতে পারেনি বিপদ একেবারে মাথার ওপর।

ডিঙিটা হুড়মুড় করে এসে পড়লো শঙ্খ সামন্তর ডিঙির গায়ে। টালমাটাল করে উঠলো ডিঙি। সামন্তর ডিঙির মাঝিরা চীৎকার করে উঠলো, রাত কাণা নাকি? ঠাওর পাও না?

কিন্তু কে কার কথা শোনে। জীবন ততক্ষণ তার দুজন সাকরেদকে নিয়ে সামন্তর ডিঙিতে উঠে পড়েছে। সামন্ত প্রথমটা বাধা দিতে গেলে গামছা দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেলেছে জীবন। আর সামন্তর ডিঙির মাঝি দুজন জীবনকে রুখতে চেয়েও পারেনি। একজন তো জীবনের হাতে মার খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়েছে। সামন্তর ছেলের বৌ ভয় পেযে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

বৌটির গায়ে যা গয়নাগাঁটি ছিল জীবন এক এক করে সবই নিয়েছে। সামন্ত'র পকেটে কটি টাকা ছিল—তাও। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি, শেষটা সামন্ত'র হাত-পা বেঁধে জলে ফেলার উদ্যোগ করে জীবন, আর তার ছোকরা

সাকরেদ বৌটির শাড়ি ধরে টানাটানি আরম্ভ করে দেয়। ঠিক সেই সময়েই জঙ্গলের হাঁকার শোনা যায়। জীবন তখন ডিঙি নিয়ে পালাবার পথ খোঁজে।

সামন্ত'র সম্বিৎ ফিরে এসেছে এতক্ষণে। বৌটি তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বৌটির সামনেই জীবনের গালে সজোরে থাপ্পড় মারে জঙ্গল। একটু চাপা আওয়াজ করে জীবন, কিন্তু মুখে 'রা' কাড়ে না।

জঙ্গল বলে, বার করে দে যা কিছু নিইছিস—নয়তো তোরে গাঙের জলে চুবিয়ে মারবো।

তবুও জীবন দাঁড়িয়ে থাকে।

এবারে জীবনের তলপেটে লাথি মারে জঙ্গল। 'কোঁক' করে আওয়াজ তুলে জীবন লুটিয়ে পড়ে বৌটির সামনে। জঙ্গল লক্ষ্য করে জীবনের কাছার কাপড়ে কি যেন বাঁধা। কাছার কাপড় আলগা করে বাঁধন খুলে জঙ্গল বার করে হার, চুড়ি, কানের দুল আর কটি জলে ভেজা নোট।

জীবন এবারে ককিয়ে ওঠে, এবারে আমারে ছাড়ান দ্যাও!

জঙ্গলদাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, মামার বাড়ির আবদার, না? এখন এই ডিঙির সঙ্গে তোরে যাতি হবে। তুই ভেবেছিস কি? জঙ্গল পাহাড়ী চাল ফুটিয়ে ভাত খায় না—কাঁচা চাল চিবিয়ে খায় না? যা, ভালো চাস তো দাঁড় টান গে।

জীবন কি যেন বলতে যায়, কিন্তু জঙ্গল তার আগেই বলে ওঠে, যা—নইলে তোর হাত দুটো মুচড়ে জখম করে দেবো।

এবারে ভালো মানুষের মতো জীবন ডিঙির মাথায় গিয়ে বসে।

—বসে থাকলি কেন, দাঁড় টান।

গাঙে তখন ভাঁটার টান শেষ হয়েছে। জোয়ার লেগেছে। সেই জোয়ারে উজান বেয়ে চলে পাশাপাশি দুটি ডিঙি। শঙ্খ সামন্তর ডিঙি কাছি দিয়ে বাঁধা জঙ্গলের ডিঙির সঙ্গে। আর জীবনের ডিঙির তখন পাত্তাই নাই।

জঙ্গল মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয় না, তার নজর জীবন ঢালির ওপর। জীবনকে সে জানে, এ তল্লাটে তার অনেক চেলা-চামুণ্ডা ছড়িয়ে আছে, একবার পারে যেতে পারলেই, ও আবার নিজের মূর্তি ধরবে, তাইতো তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে জঙ্গল।

সামন্ত এতক্ষণে ভরসা পেয়েছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে বুকটাকে হালকা করেছে। বৌটিও চোখের জল মুছে ফেলেছে।

সামন্ত এবার জঙ্গলের একটা হাত ধরে বলে, কি আর বলবো ভাই—তোমার কথা তো জানি, ভগবান তোমাকে পাঠিয়ে দেছেন।

খামোকা ভগবানের কথা শুনে জঙ্গল খ্যাঁক করে ওঠে।—তোমাদের কথা শুনলি গা জলে যায়। ভগবান! ভগবান আবার কি? তার ঠিকানা জানো?

—রাগ করো কেন? সামন্ত মিষ্টি সুরে বলে, আমার যা মনে হলো তাই বললাম।

জঙ্গল একথা নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। ছই-এর বাইরে ডিঙির পাটাতনের ওপর গিয়ে বসে। তার সতর্ক দৃষ্টি জীবনের ওপর। সামনের বাঁক না পেরানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

সেই সন্ধ্যে থেকে আকাশে শেষ জ্যৈষ্ঠের মেঘ জমাট বেঁধে আছে। এই সময় বাতাস এক রকম ছিল না বললেই চলে, এবারে কোত্থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এলো। তরঙ্গ উঠলো রায়মঙ্গলের জলে। ঢেউ-এর তালে তালে ডিঙি ওঠা-নামা করতে লাগলো। একে মুখোট বাতাস, তারপর উজান বেয়ে যাওয়া—দাঁড় টানতে জীবন নাজেহাল।

আর হাল ছেড়ে বসে থাকা ঠিক নয়, এবারে জঙ্গল নিজেই হাল ধরতে গেল।

হালের মুঠি ধরে আকাশের দিকে তাকায় জঙ্গল—ধূসর মেঘ কালো হয়ে উঠেছে। জল না দিয়ে যাবে না।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামলো মুষলধারায়। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় ছুটে এলো। মাতাল হলো রায়মঙ্গল— রস্ত ঢেউ-এ ডিঙি টালমাটাল করতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য কুশলী জঙ্গল, সে জানে কেমন করে ঢেউ কাটিয়ে যেতে হয়।

সেই প্রচণ্ড জল-ঝড়ের মধ্যে দুরন্ত রায়মঙ্গলের মাঝদরিয়া বরাবর ডিঙি চললো দক্ষিণ-মুখো। ক্ষণ-বিদ্যুতের আলোয় পারের মাটি লক্ষ্য করলো জঙ্গল। সামনেই বাঁক পেরিয়ে পুঁইজালির গাঙ। কিন্তু যে রকম ঝড়ের দাপট তাতে পুঁইজালির ঘাটে পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

বৃষ্টি যদিও ঝরছে তবে তেমন অঝোরে নয়। ঝড়ের দাপটও কমে এসেছে। যদিও আকাশে ঘন মেঘ, তবু পূবের আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে।

পুঁইজালির ঘাটে ডিঙি বাঁধলো জঙ্গল। ডিঙি থেকে নামলো শঙ্খ আর তার পুত-বৌ।

পারে নেমে সামন্ত বলে, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না জঙ্গল?

—না। জঙ্গল এক কথায় তার উত্তর শেষ করে।

—তুমি না এলে আমাদের মনে দুঃখ থাকবে।

—তাতে আমার কি? জঙ্গলের কণ্ঠস্বর কেমন যেন রুক্ষ শোনায়। তোমরা যাও, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

সামন্ত আবার বলে, তোমারে আমি বুঝতে পারলাম না জঙ্গল।

—বোঝার চেষ্টা কোরো না—জঙ্গল বলে, আমিই আমারে বুঝিনে, তা তোমরা বোঝবা কি করে!

সামন্ত-আর তার পুত-বৌ নরম কাদার ওপর দিয়ে পারের ভেড়ি পথে উঠলো। জঙ্গল দেখলো, ভেড়ির ওপর দাঁড়িয়ে তারা তাকেই দেখছে। কি মনে হলো জঙ্গলের, চীৎকার করে বললো, পুঁইজালির ঘাট বরাবর যদি কখনো আমি যাই, তোমাদের কথা আমার মনে পড়বে। আমি এখন যাই—

লগি মেরে ডিঙিটাকে আবার ঠেলে দিলে জঙ্গল।

আড়াআড়ি ডিঙি নিয়ে চললো জঙ্গল। আড় পারেই দু নম্বর ঘাট। পারে ডিঙি লাগার আগেই আচমকা জীবনকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে জঙ্গল। বললে, যা—এবারে বাড়ি যা কুত্তার বাচ্চা।

সাঁতার কেটে পারের মাটিতে গিয়ে উঠলো জীবন। ডিঙির মুখ ফিরিয়ে জঙ্গল আরো একবার চীৎকার করে জানিয়ে দিলে, আমার নামটা মনে রাখিস।

॥ দুই ॥

পারঘুমটির হাটখোলার পাশেই হিমে সা'র আড্ডা। পাশাপাশি দুটি দোচালা। আঁটকুড়ো হিমে সা একটাতে তার মোটাসোটা বৌ-নিয়ে থাকে। আর একটি চালায় তার আড্ডা।

সন্ধ্যে হতেই আড্ডা জমে ওঠে। গরান কোঁড়ায় তৈরি বেঞ্চিগুলোতে বসে থাকে নেশাখোর মানুষগুলো, আর একান্তে গাঁজলা ওঠা তাড়ির কলসি আর কাঁচের গেলাস নিয়ে বসে থাকে হিমে সা। এ ছাড়া ঝাঁঝালো জিনিস থাকে হিমে সা'র শোবার ঘরে। খদ্দের এলে বার করে আনে ছিপি আঁটা বোতল।

আজও হিমে সা'র আড্ডা গুলজার। আট দশ জন বসে আছে। মাঝখানে একটা কেরোসিনের কুপী যত না আলো দিচ্ছে, তার চেয়ে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে বেশী।

আবছা আলোয় তাড়ি খোর মানুষগুলো বুঁদ হয়ে আছে।

জঙ্গল দোচালায় ঢুকতেই মানুষগুলো একটু নড়ে চড়ে বসলো। কেরোসিনের কুপীর শিখাটা কাঁপছে। সে আলোয় চেনা মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হিমে সা'র পাশেই চৌকির ওপর একটু জায়গা করে নিয়ে বসে পড়লো জঙ্গল।

—কি রে পথ ভুলে নাকি? হিমে সা জিজ্ঞাসা করে।

হিমে সা'র আড্ডায় বড় একটা বসে না জঙ্গল, তাছাড়া এসব মাতালের আড্ডাতেও তার মন নেই। অথচ আজ অথচ আজ সে এসে পড়েছে ঠিক আড্ডার সময়েই।

—এই এসে পড়লাম আর কি।

—তা বেশ। হিমে সা কাঁচের গ্লাসে তাড়ি ভার এগিয়ে দেয় জঙ্গলের দিকে। নে গলাটা একটু ভিজিয়ে নে।

—দুর, জঙ্গল নাক-মুখ সিঁটকে বলে, মাল খাই বলে ওসব খাইনে।

—আরে দ্যাখনা একটু খেয়ে।

—না। আর কিছু থাকে তো নিয়ে এসো।

হিমে সা জঙ্গলের মুখের দিকে চায়, তারপর হঠাৎ কি মনে করে জিজ্ঞাসা করে, একটা কথা শোনলাম—সত্যি নাকি রে জঙ্গল?

—'কি শুনলে ?

—তুই নাকি জীবন ঢালিরে খুব টাইট দিছিস !

—টাইট আর দেলাম কই। জঙ্গল দোচালার মধ্যেকার মানুষগুলোর দিকে মুখের তাকায়। সবাই চেনা-জানা, কিন্তু ওর মধ্যে হারামজাদা কানাইটাও রয়েছে। ও লোকটাকে দু চোখে দেখতে পারে না সে। জানে, এখানে যা কথা হবে সময় মতো ও ঠিকই পৌঁছে দেবে জীবনের কানে। যদিও তাতে কিছু যায় আসে না জঙ্গলের, তবু সেদিনের ঘটনার কথা তুলতে চায় না। বলে, ও সব কথা বাদ দাও, এখন বলো তো চালানি মালটাল কিছু আছে নাকি ? থাকে তো দাও।

কানাই-এর চোখ দুটো তখন তাড়ির নেশায় লাল। জঙ্গলের কথার পিঠে সে বলে ওঠে, যারে হিমে, দেখগে কি আছে তোর ঘরে। দেখিস, তা বলে যেন—কথা শেষ করে না কানাই। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ করে বিদঘুটে ভঙ্গিতে হেসে ওঠে। জঙ্গলের মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে যায়। কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে। শুধু একবার কটমটিয়ে ফিরে চায় কানাই-এর মুখের দিকে। কানাইও তেমনি, হাঁটু নাচাত আরম্ভ করে নেশার ঝোঁকে।

হিমে সা কি যেন বলে জঙ্গলের কানে কানে। জঙ্গলের মুখে খুশি খুশি ভাব ফুটে ওঠে। তারপর জঙ্গলের হাত ধরে হিমে সা পিছনের দোচালার দিকে যায়।

হিমে সা'র ঘরণী সুমণি থলথলে শরীর নিয়ে ঘরের দাওদায় পা ছড়িয়ে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। স্বামীর সঙ্গে জঙ্গলকে দেখে একটু সামলে বসে।

—কেমন আছো খুড়ি ? জঙ্গল দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়েই সুমণির কুশল জানতে চায়।

সুমণি এমনিতে সাদাসিধে স্বভাবের। বলে, আমি তো ভালো আছি, কিন্তু তোদের খুড়ো আর ভালো থাকতি দেচ্ছে কই ? এত করে বলি, এ সব কারবার এবারে ছেড়ে দেও—

হিমে সা খ্যাঁক করে ওঠে, আঁটকুড়ো মাগীর কথা শুনিছিস জঙ্গল, গা জ্বলে যায় শুনলি।

—গা জ্বলে তো গাঙের জলে ডুব দে এসো। সুমণি বেশ ঝাঁঝালো সুরেই বলে, তাও তোমারে যদি না চেনতাম। পাড়ার লোকে সকালে উঠে তোমার মুখ দেখে না—বলে অনামুখো যাচ্ছে

হিমে সা কথা বাড়ায় না। সোজা ঘরের মধ্যে চলে যায়। জঙ্গলও

কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে সুমণির সামনে দাঁড়াতে। সরে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সুমণিই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। বলে, হ্যাঁ রে জঙ্গল, ডাকিস তো খুড়ি বলে, কিন্তু মনে রাখিস কোথায়? তোর মা সেদিন আমার সঙ্গে কতো দুঃখু করতিছিল—এবারে বাউণ্ডুলেপনা ছেড়ে দে।

হিমে সা একটা গামছা জড়ানো পোঁটলার মতো বগলদাবায় করে বাইরে এলো। পাশেই কলাঝাড়, ইঙ্গিতে জঙ্গলকে ডেকে নিলে কলা ঝাড়ের আড়ালে।

গামছায় জড়ানো তিনটি বোতল, একটির ছিপি খুলে জঙ্গলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, নে একটু চেখে গ্যাখ।

বোতলের মুখটা মুখের মধ্যে পুরে ঢক ঢক করে খানিকটা গিলে নেয় জঙ্গল। তারপর বলে, বাঃ—খাসা মাল তো, তুমি পেলে কোথায়?

কদিন আগে ক্যানিং গিয়েছিল হিমে সা, সেখানে ইটখোলার সাঁওতালদের কাছে এই জিনিসের সন্ধান পায়। কিছুতেই তারা এ জিনিস দেবে না, শেষটা নগদ টাকায় দেড়া দাম গুনে দিতে, তবে দিয়েছে। কটা বোতল দিয়েছে মালেকানঘুমটির ভীম মোড়লকে। আর এই তিনটে বোতল রেখেছিল ঘরে, তারই একটি জঙ্গলের হাতে।

জঙ্গল বলে, অতো কথায় কাজ কি, যা আছে আমারে দাও। আর কতো কি দিতে হবে বলো, কাল যখন হোক দে যাবানে।

—সে যা হোক হবে। হিমে সা একবার এদিক ওদিক তাকায়। তারপর কিছুটা নীচু গলায় বলে, একটা কথা তোরে বলতে ইচ্ছে করছে, মাথা গরম না করিস তো বলি।

—কি?

—কানাই আজ তোর কথা নে মাচায় বসে খুব তড়পাচ্ছিল। ওর সঙ্গে নাকি জীবন ঢালির দেখা হয়েছিল তুষখালির হাটে। জীবন নাকি ওকে ডেকে বলে দেছে, জঙ্গল পাহাড়ীরে সে এমনি ছাড়বে না। যদি তারে না খাসি করে দেয় তো সে বাপের বেটা নয়।

জঙ্গল আরো একবার বোতলের মুখটা ঠোঁটের ফাঁকে ভরে দিয়ে খানিকটা 'মউল' গিলে নেয়। সেই মুহূর্তে তাকে উত্তেজিতও মনে হয়। কিন্তু হিমে সা'কে সে 'মাম্যি' করে। কথা যখন দিয়েছে তখন মাথা গরম করবে না। পাহাড় নড়ে তবু জঙ্গলের কথা নড়ে না। মুখে একটা চাপা শব্দ করে বলে, কানাইরে বলে দিও, জীবনের সঙ্গে দেখা হলে যেন বলে দেয় জঙ্গল পাহাড়ী মা'র পেটে জন্মেছে।

বলে আর দাঁড়ায় না জঙ্গল। সোজা পা চালায় বাড়ির দিকে।

জঙ্গলের বুড়ি মা কামিনী বাইরের দাওয়ায় কেরোসিনের কুপী জ্বেলে বসেছিল। ছেলেকে ফিরতে দেখেই জিজ্ঞেস করে, কিরে—আজ এতো তাড়াতাড়ি ফিরলি?

মউলের নেশাটা এরই মধ্যে বেশ জমে উঠেছে। যদিও নেশায় কাবু হয় না জঙ্গল, তবু তার কড়া আমেজটা তো আছে। মা তার নাড়ি নক্ষত্রের সব কথাই জানে, তবু জঙ্গল কোনো দিন নেশা করে মা'র মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না। আজও দাঁড়ালো না। 'ইচ্ছে হলো তাই চলে এ্যালাম' বলে ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

কামিনী বুঝতে পারে ব্যাপারটা। তার ছেলের 'চরিত্তির' তো অজানা নয়। নেশা করে ঘরে ফিরলে জঙ্গলও যেমন মা'র কাছে আসতে চায় না, কামিনীও তেমনি ছেলের কাছে যায় না। আজ কি মনে করে জঙ্গলকে ডাকলো কামিনী।

দরজার চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ালো জঙ্গল।

কামিনী বলে, হ্যাঁ রে তুই একটু থির হবি নে?

—মা, এ আমার রক্তের দোষ; আমি কি আমারে শোধরাতে পারি? ঠাকুর্দা আমার বুনো হাতীর সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দেছে, বাবা সুন্দরবনের বাঘের মুখে গেছে, আর আমি!

কামিনী দুহাতে কান চাপা দেয়। বলে, যা খুশি তুই করগে, তোর ওসব কথা আমি শুনতি চাইনে। ওই কথা শোনবো বলে কি তোরে ডাকলাম। তুই দিনকে দিন ব্যাদড়া হয়ে যাচ্ছিস।

—ঈশ্বর পাহাড়ী তস্য পুত্র দুর্জয় পাহাড়ী, নিজের বুকে চাপড় মেরে জঙ্গল বলে, আর তস্য পুত্র এই জঙ্গল পাহাড়ী।

কামিনীর বুকটা যেন কেঁপে ওঠে। এ বংশের ধারা সে জানে। জানে এ বংশের ওপর রয়েছে দুরন্ত অভিশাপ।

জঙ্গলের ঠাকুর্দা ঈশ্বর পাহাড়ীর বাস ছিল চিলকিগড়ের কাছে।

সর্দার ছিল সে। চিলকিগড়ের রাজার ঠাঙাড়েদের সর্দার। সেই জঙ্গল এলাকার মানুষ তার নামে কাঁপতো। এক-একটা শালের কোড়া নিয়ে সে লাঠির মতো ঘুরপাক খাওয়াতো।

কিন্তু সে-ই মানুষটার জীবনে নেমে এলো দুরন্ত অভিশাপ। ধলভূমগড়ের

জঙ্গলে রাজা বাহাদুরের সঙ্গে শিকারে গিয়ে গর্ভবতী বাঘিনীকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছিল ঈশ্বর। আর সেই রাত্রেই সাক্ষাৎ চণ্ডী তাকে অভিশাপ দিয়ে যায়। যার কদিন পরেই বুনো হাতীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হাতীর পায়ের চাপে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে মারা যায় ঈশ্বর পাহাড়ী। আর ঈশ্বর পাহাড়ীর স্ত্রী তখন গর্ভবতী। স্বামীর মরণ সে চোখে দেখেছে। দেখেছে হাতীর পায়ের চাপে থেঁতলানো দেহটা। মাথাটা তো একদম গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

দুর্জয় পাহাড়ী জন্মালো এক জঙ্গলের দেশ ছেড়ে আর এক জঙ্গলের দেশে—সুন্দরবনে। গর্ভবতী মা ধলভূমগড় ছেড়ে চলে এসেছিল বড় ভাই-এর কাছে। কিন্তু সেই দুরন্ত অভিশাপটা পিছু পিছু ধাওয়া করলো। বাপের রক্তই তো ছেলে পেয়েছে—তার রক্তেও সেই দুরন্ত আগুন।

জোয়ান বয়সে কামিনীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল দুর্জয় পাহাড়ীর। সবাই বলেছিল, কামিনীর স্বামী মরদ বটে। অমন দশাসই চেহারা, অমন বুকের পাটা এ তল্লাটে আর কার আছে! স্বাস্থ্যবতী কামিনীর বুকটা গর্বে ফুলে উঠতো সে সব কথা শুনে।

দুর্জয় পাহাড়ীকে নিয়ে কদিনই বা ঘর করলো কামিনী। বিয়ের পর দশটা বছর না যেতেই সব খেলা ফুরিয়ে গেল। জঙ্গল তখন সাত বছরের ছেলে।

কামিনী ভোলেনি সেই ভয়ংকর দিনের কথা। বেলা দুপুর—শীতের রোদ গায়ে মেখে দুর্জয় শুয়ে ছিল ঘরের দাওয়ায়। কামিনী ঘরকন্না সেরে সবে এসে বসেছে স্বামীর কাছটিতে, আর সেই মুহূর্তে কুমিরমারির হারু মোড়ল এলো খবর নিয়ে—একটা বাঘিনী নাকি ভয়ানক উৎপাত করছে সমশের নগরে। তিন তিনটে মানুষ মেরেছে, পাঁচ সাতটা গরু ছাগল। শুধু খবরটা শোনার অপেক্ষা। গাদা বন্দুকটা হাতে নিয়ে দুর্জয় পাহাড়ী চললো সমশের নগরে। সঙ্গে চললে তার দোসর ওসমান। কামিনী পইপই করে মানা করলো —কিন্তু কোন কথাই কানে নিলে না দুর্জয়। বুক ফুলিয়ে জানিয়ে গেল, দশ-দশটা বাঘকে খতম করিছি, আর এটার বেলায় পিছিয়ে পড়বো—আমার নাম দুর্জয় পাহাড়ী আমার বাপের নাম ঈশ্বর পাহাড়ী।

তিন দিন তিন রাত। দুর্জয় গেছে সমশেরনগরে—কামিনী অপেক্ষা করে আছে কখন আসবে মানুষটা।

মানুষটা এলো না। খানিকটা হাড়গোড়ের সঙ্গে রক্ত মাখা মাংস নিয়ে এলো ওসমান চার দিনের দিন সকালে।

পুরনো কথা ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কামিনী। জল ঝরে তার দু চোখে।

—জঙ্গল আছিসরে—জঙ্গল? ফ্যাসফেঁসে গলায় কে যেন ডাকছে উঠোনের ওদিক থেকে।

একটা ভয়ংকরের মতো অন্ত বাউলি এসে দাঁড়ায় উঠোনে। শুকনো কাঠির মতো চেহারা, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল। মুখের চামড়ায় রেখার জাল, নাকটা ছুঁচলো—টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো, চোখ দুটি গুলি খোরের মতো, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

কেরোসিনের কুপীর আলোয় অন্ত বাউলির ভয়ংকর চেহারাটা স্পষ্ট। পরনে তেলচিটে কাপড়, গায়ে তালি দেওয়া কাঁথার জামা, গলায় ঝুলছে এক রাশ মালা। কোনোটি রুদ্রাক্ষের, কোনোটি তুলসীকাঠের, কোনোটি হাড়ের। দুহাতে কনুই-এর ওপর ঢাক-ঢোলের মতো এক গাদা মাদুলি। হাতে মান্ধাতার আমলের বাঁশের লাঠি। আর দু-কাঁধে ঝোলানো দুটি ঝুলি, যাতে জড়িবুটি থেকে আরশি চিরুনি পর্যন্ত থাকে।

চালচুলো নেই এই বিচিত্র মানুষটার। বারোমাস ঘুরে বেড়ায় এর ওর বাড়ি। কখনোসখনো কোথাও উধাও হয়ে যায়, দু পাঁচ মাস পাত্তাই মেলে না।

বাদা অঞ্চলের ডাকসাইটে বাউলি অন্ত দাস। দাস উপাধিটা হারিয়ে গেছে, এখন সবাই বলে অন্ত বাউলি। বাদাবনের রাজা বাঘ ওর নামে ডরায়, গিধেভাঙা কেউটে ফণা নামিয়ে গর্তে সেঁধোয়। মৌ-ভাঙার মরশুম এলে যেখানেই থাকুক অন্ত বাউলি ঠিকই এসে হাজির হবে বাদা-বনের দেশে। মউলেদের ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে বলবে, আমি এইছিরে। কিন্তু এবারে সে অসময়েই এসেছে।

অন্ত বাউলি যেন সাক্ষাৎ বনবিবির চেলা। মউলেরা ভরসা পায় ওর নামে। নয়তো আরো কতো বাউলি আছে, কিন্তু সবাই-এর কাছ থেকে বনবিবি কর নেয়, কিন্তু অন্ত বাউলি একবার ছাড়া দু'বার কর দেয়নি। বনবিবির চেলা অন্ত বাউলির ওপর ভর করে বাবা দক্ষিণ রায়, গাজীপীর। বাউলি নিজে বলে, আমি যখন বাদায় যাই, তখন মানুষ থাকি না রে।

মানুষটাকে আজ ঘরের উঠোনেও জীবন্ত প্রেতের মতো মনে হচ্ছে। এমন তো ছিল না আগে। এই তো তিন মাস আগেই মৌ-ভাঙার মরশুমে এখানে ছিল—তিন মাসের মধ্যে মানুষটা যেন বদলে গেছে।

—কামিখ্যে ঘুরে এ্যালাম, ফেরার পথে তারাপীঠের শ্মশানে দিন কতক

ছেলাম।—অন্ত বাউলি বসতে বলার অপেক্ষা করে না, দাওয়ার ওপর উঠে চৌকিতে বসে ঝোলাঝুলি নামিয়ে রাখে।

অন্ত বাউলি দাওয়ায় উঠতেই কামিনী কামরায় গেছে। এ মানুষটিকে দেখলেই তার কেমন যেন ভয় হয়। আবার মানুষটাকে দেখলে কখনো কখনো ভক্তির ভাবও জাগে মনে। কিন্তু মুখে ভালো মন্দ কিছু বলে না।

—তোমারে দেখে যে চেনাই যায় না বাউলি। জঙ্গল কেরোসিনের কুপীটা বাউলির মুখের সামনে তুলে ধরে। বলে, কি হাল হয়েছে তোমার?

—কি আবার হবে! টিকিট কাটা হয়ে গেছে, এবারে গাড়ী এলেই উঠে পড়বো।

অন্ত বাউলির গলার আওয়াজ কেমন ফ্যাঁসফেঁসে ভাঙা ভাঙা, আর কথা বলতে যেন হাঁপাচ্ছে।

—তোমার কি হয়েছে বলো দিকিনি?

—যা হবার তাই হয়েছে, গলায় বুকে ঘা হয়েছে। অন্তিম কালের রোগ; এই রোগই আমারে টেনে নে যাবে।

বলে ঝুলি থেকে গাঁজার কলকে বার করলো অন্ত। তারপর টিনের কৌটো থেকে গাঁজা বার করে হাতে থুতু ছিটিয়ে দু হাতে পিষতে লাগলো। খুক খুক করে কেশে গলা ঝেড়ে বললে, খানিকটে গুড় আর জল নে আয়, আগে তেষ্টাটা মিটিয়ে নেই। হ্যাঁ রে, খুড়ি রে দ্যাখলাম এখেনে বসে ছিল, গেল কোথায়?

কামিনীর কানে গেছে বাউলির কথা। একটা বাটিতে খানিকটা গুড় আর এক ঘটি জল এনে বাউলির সামনে রাখে।

অন্ত বাউলি পায়ের ধুলো নিতে যায় কামিনীর, কামিনী সরে দাঁড়ায়। বলে, করো কি?

—এ তল্লাটে তুমিই আছো মা'র মতন। তোমারে দেখলি মাথাটা পায়ে ঠেকাতে ইচ্ছে করে।

—তা হোক, তুমি গুণীন লোক, আমারে পেরনাম করবা কেন?

—ওসব গুণীনটুনিন কিছু না। কামিনীর পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকায় অন্ত। বলে, তোমরা মায়ের জাত—একবার মা বলে ডাকত্তি পারলেই পেরান ভরে যায়। কিন্তু ডাকত্তি পারি কই।

সঙ্গের ঝোলা থেকে একটি মালা বার করে কামিনীর হাতে দেয় অন্ত। বলে, এটা গলায় না দ্যাও, ঘটে কিংবা পটে জড়িয়ে রাখবা। কামিখ্যের

উমানন্দ ভৈরবের মালা—এ মালায় অনেক গুণ, ডাকলে ডাক শোনে। ঘরে রেখে দেবা কোনো বিপদ আপদ হবে না।

কামিনী হাত পেতে নেয় মালা। মাথায় ঠেকায়। তারপর বলে, অনেক কিছুই তো জানো বাউলি, দাও না আমার পাগলা ছেলেটারে একটু শান্ত করে। ও যে একেবারে বয়ে গেল।

অন্ত বাউলি হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে তার কষ্ট, তবু প্রাণ খোলা হাসি হাসলো। বললে, গাঙ দেখেছো খুড়ি—দামাল গাঙ শীতের দিনে ভরা জোয়ারে কেমন শান্ত হয়ে যায়। আজ যারে দুরন্ত ত্থাখো, কাল দ্যাখবা সে কতো শান্ত হয়ে গেছে। জীবনে ঝড় বাদলের মরশুম আসে তারপর দিন এলে আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

জঙ্গল বলে ওঠে, আমি কোনদিন শান্ত হবো না বাউলি।

আরো খানিকটা গুড় মুখে দিয়ে জল পান করে অন্ত। বলে, শান্ত তোরে হতি হবে। দেখিসনি বান যখন আসে তখন তার কতো হাঁক ডাক, আর বান যখন চলে যায়!

অন্তর চোখে মুখে হাসির ঝিলিক। সে ফিরে চায় জঙ্গলের মুখের দিকে।

জঙ্গল বলে, রাখো তোমার ও সব বুকনি—এখন বলো দিকিনি কি সমাচার তোমার?

অন্ত বাউলি এবারে কামিনীর মুখের দিকে ফিরে চায়। হয়তো কামিনীর সামনে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছে না সে। তারপর গাঁজাটা দলা পাকিয়ে কলকেয় ভরে রেখেছে। একটু ধোঁয়া না গিলতে পারলে স্বস্তি নেই। কামিনীর সামনে কলকেয় আগুন দিতেও পারছে না।

কামিনী এবারে ঘরের মধ্যে যায়। অন্ত কোঁচার আড়াল থেকে কলকেটা বার করে। পাকানো নারকেলের ছোবড়া কলকেয় দিয়ে তাতে আগুন ধরায়। জলে ভিজিয়ে নেয় ত্যাকড়ার ফালি। তারপর 'জয় বাবা' বলে বার কয়েক ফুস ফুস করে টান দিয়ে আগুন ধরিয়ে নেয়। এবারে দমভোর একটা টান দিয়ে খানিক সময় ধোঁয়া গিলে রাখে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে যায় দমকা কাশি; সারা দেহটা দুমড়ে কুঁকড়ে যায়। কিন্তু নিজেকে সামলে নেয় বাউলি। কলকেটা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, নে টান—বাবা উমানন্দ ভৈরবের পেরসাদ।

—ও শুকনো নেশা আমি করিনে বাউলি।

—তা করবি কেন! হাপর টানার মতো নিশ্বাস নেয় বাউলি। বলে,

জঙ্গলরে—এ হলো বাবার পেরসাদ, নেশা বলিস নে। এক টান টেনে ছাখ, দেখবি তুই বাবার ঠাঁই কৈলেসে চলে গিছিস, দেখবি মা আর বাবা পাশাপাশি বসে আছে, সামনে রয়েছে বুড়ো ষাঁড়টা।

কথার শেষে দম ফাটা কাশি কাশে বাউলি। তার মধ্যেও কিছু বলতে যায়, কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না। কাশির আওয়াজ আর ঘড়ঘড়ে টানে কথাগুলো হারিয়ে যায়। তারপরেই মানুষটা কেমন দুমড়ে কুঁকড়ে দাওয়ার ওপর লুটিয়ে পড়ে।

জঙ্গল ভয় পায়, শেষটা না মরে যায় বাউলি। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই বাউলি আবার উঠে বসে। কলকেটা ঝোলার মধ্যে ভরে রাখে, খানিকটা গুড়-জল ছিল, সেটুকুও খেয়ে ফেলে। আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বলে, একটা চেটাইটাটাই পেতে দে জঙ্গল, একটু ঘুমিয়ে নেই। তিনদিন তিনরাত ঘুমুই নে। পথে পথে ঘুরতিছি।

দাওয়ার ওপর চাটাই বিছিয়ে দেয় জঙ্গল। ঘর থেকে একটা বালিশও নিয়ে আসে। কিন্তু বালিশটা সরিয়ে দেয় বাউলি। বলে, অতো আরাম আমার জন্যি না।

মাথার নীচে একটা হাত ভাঁজ করে দিয়ে শুয়ে পড়ে বাউলি। যদিও ঘুমিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে, কিন্তু পরক্ষণে আবার তার ঘুম ভেঙে যায়। দমকা কাশিতে অস্থির হয়ে ওঠে। ঝোলা থেকে একটা টিনের কৌটো বার করে দলা দলা গয়ের ফেলে। আবার পর মুহূর্তে দু'কস মুছে হাতের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

সর্দি ওঠায় স্বস্তি পেয়েছে বাউলি। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যেও তার বুকের ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ানি শব্দ ওঠে। কেরোসিনের কুপীটা সরিয়ে নেয় জঙ্গল। মানুষটা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

বাউলির সঙ্গে কথা বলতে নেশাটা কেমন আলগা হয়ে গিয়েছিল জঙ্গলের। চুপচাপ বসে থাকতে আবার যেন শিরার রক্ত শিরশিরিয়ে উঠলো। মনটা কেমন পেঁজা তুলোর মতো হালকা হয়ে গেল।

মায়ের ডাক শুনতে পেল জঙ্গল। দাওয়ার ওপর থেকেই সাড়া দিলে সে।

মা দরজার কাছে এলো। বাউলি ঘুমোচ্ছে দেখে বললে, মানুষটা এয়েচে, খাবে দাবে তো?

—খাবে বৈকি। জঙ্গল বললে, উঠেছে আমাদের বাড়ি, খাবে কি অন্য জায়গায়?

—সে কথা বলতিছিনে, কামিনী বলে, ঘরে তো চাল ছাড়া কিছু নেই, যা হোক একটু মাছ-টাছ নে আয়, নয়তো খাবে কি দে।

—অ, ভাই বলো।

চালের বাতায় জালগাছটা ঝোলানো ছিল, খুলে নিয়ে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে যায় জঙ্গল। যদিও তার পা টলছে মহুয়ার নেশায়, যদিও মনটা তার পেঁজা তুলোর মতো হালকা—তবুও পথ পেরিয়ে বাঙোড়ের ভেড়িতে নামলো জঙ্গল।

চারদিক ধু ধু করা মাঠ জুড়ে নতুন ধানের ফসল। তারই মাঝে খানিকটা নাবাল জায়গা জুড়ে জলাভূমি। এই জায়গাটিকেই এ তল্লাটের লোক বলে সোনাচাঁদের বাঙোড়। বারো মাস কিছু না কিছু জল থাকে। জলের নীচে খেলে বেড়ায় সোনালী-রূপালী মাছেরা।

আগে এ বাঙোড়ের দখলদার ছিল যোগেশগঞ্জের বাসুদেব মোড়ল। এই বাঙোড়ের মাছ থেকেই তার যত বোলবোলোয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোড়লমশায় বাঙোড়ের দখল রাখতে পারলো না। বাদ সাধলো ঘুমটি, পারঘুমটি আর আশেপাশের গ্রামের সাধারণ মানুষরা। সে দলে জঙ্গলও ছিল। সেই তো ছিল দলের সর্দার। এক রাতেই তারা মেছোঘেরি উঠিয়ে দিলে। থানা পুলিশ করতে চেয়েছিল বাসুদেব মোড়ল, কিন্তু জঙ্গল তার গাদা বন্দুকটা বাগিয়ে নিয়ে মোড়ল মশায়কে শাসিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'এত কাল তো লুটেপুটে খেয়েছো—এখন আর মেছোঘেরির ওপর নজর দিয়ো না। আর মেছোঘেরির ব্যাপার নে থানা পুলিশ করতি গেলে ফল ভালো হবে না।' বাসুদেব মোড়ল তবুও গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিল সোনাচাঁদের বাঙোড়ের ব্যাপারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিল।

বাঙোড়ের ধারে এসে দাঁড়ালো জঙ্গল। বর্ষায় টলমল করছে বাঙোড়ের জল। ধারে ধারে শালুক-কলমির দাম। এক-আধটা শালুকও ফুটে রয়েছে।

এদিক ওদিক তাকালো জঙ্গল। দ্বিতীয় মানুষ নেই। দেখে শুনে খ্যাপোন মারলো জলে। ভুল করে হালকা কাঠির জালগাছটা এনেছে। ছোট ঘাই—বড় মাছ বেড় পড়বে না।

জালটাকে তলিয়ে যেতে সময় দিলে জঙ্গল। তারপর দড়িতে আলতো টান দিতেই জাল সমেত একটা বড় মাছই হবে, 'উলুস' দিয়ে উঠলো। বড় মাছ হয় যদি ঘাইতে ধরা পড়বে না। জালের দড়ি হাতে নিয়ে নেমে পড়লো

জলে। প্রায় এক গলা জল। সেই গলা জলে নেমে জালের ঘাই পাঁকের মধ্যে চেপে দিতে লাগলো। মাছটা তখনো এদিক-ওদিক করছে। এবারে পা দিয়ে জাল চাপতে আরম্ভ করলো জঙ্গল। মাছের ছটফটানি বাড়লো। জলের মাছের দাপট কম নয়—মাছের গায়ে পা পড়তেই সজোরে ঝটকা দিল। কাঁটা বিঁধলো জঙ্গলের পায়ে। কেমন যেন রোখ চেপে গেল তার। ডুব দিয়ে জাল সমেত মাছটাকে জড়িয়ে ধরলো।

উঠে এলো ডাঙায়। বেশ বড়ো একটা কুঁজো ভেট্‌কি। মাছটাকে সজোরে আছাড় মারলো মাটিতে। একটু ছটপট করে মাছটা স্থির হয়ে গেল। কাঁধের ওপর জালগাছটা ফেলে মাছটাকে হাতে ঝুলিয়ে জঙ্গল ফিরে এলো ঘরে।

বাউলি ঘুমোচ্ছিল। জঙ্গলের হাঁক-ডাকে উঠে পড়ে। চোখের সামনে বড় কুঁজো ভেট্‌কি আর জঙ্গলের অবস্থা দেখে বাউলি বলে, তুই কি রে—এই রেতে এ সবের কি দরকার ছিল!

গামছা দিয়ে ভিজে মাথা মুছতে মুছতে জঙ্গল বলে, তুমি চুপ করে বোসো দিকিনি—আমার ঘরে এয়েছো তুমি—তুমি আমার অতিথ্‌—

—অতিথ্‌ নয়রে, আমি তোদের ঘরের মানুষ। তোর বাপেরে আমি খুড়ো বলে ডাকতাম। বাউলি একবার চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, খুড়োর কথা মনে হলি মনটা এখনো হু হু করে ওঠে। জানিস আমাদের খুড়োর মনটা ছিল রায়মঙ্গলের মতো বড়ো। আর তুই তো দেখি একেবারে সাগরে গিয়ে মিশেছিস।

জঙ্গলের নেশাটা জলে ডুব দিয়েও কাটে নি। বরং আরো জমেছে। উন্মত্তের মতো অগোছালো ভঙ্গিতে হেসে ওঠে।—ওই কথাটা আর একবার বলো বাউলি।

—তুই তো হাসতিছিস, এখন ওই মাছটারে কাটাকুটি করে খুড়িকে তো রান্না করতি হবে। খুড়ির এখন বয়েস হয়েছে—এতো কি পারে?

—যারে তুমি এখনো চিনলে না বাউলি। এই সে দিনে শান্ত ভুইঞার মেয়ের বে গেল, দেড়শ মানুষের রান্না তো মা-ই করলে।

—শান্ত'র কোন মেয়েটার বে হয়েছে রে? সেই ট্যারা মেয়েটার নাকি?

—হ্যাঁ গো, খুব ভাল বে হয়েছে। মোল্লাখালির স্কুলে মাষ্টারি করে, আবার জমিজিরেতও আছে কিছুটা।

—ওরেই বলে কপাল, বাউলি বলে, ওই মেয়েটার জন্তি শান্ত'র মনে শান্তি ছিল না—যাক ভালই হয়েছে।

—ভালো হয়নি বাউলি। জঙ্গল ভিজে কাপড় ছেড়ে বাউলির পাশেই চাটাই-এর ওপর বসে পড়ে। বলে, মেয়েটা বরের ঘর করতি পারলো না, এই তো কটা দিন আগে গয়নাগাঁটি খুইয়ে বাপের ঘরে ফিরে এয়েচে।

—কেন?

টিনের কৌটো থেকে দুটো বিড়ি বার করে জঙ্গল একটা বাউলিরে দিয়ে নিজে একটা ধরালো।

বাউলি বিড়িতে টান দিয়েই কাশতে আরম্ভ করলো। এক দলা গয়ের ফেললো। পরপর বার কয়েক গলা ঝাড়া দিয়ে বললে, মেয়েটা কেন ফিরে এলো বললি নে তো?

—মাস্টার ছোঁড়া নাকি মেয়ে দেখেনি। তার বাপ বিয়ে দেছে সাত ভরি সোনা, আর নগদ দু'হাজার টাকার লোভে। বাজনা বাজিয়ে বিয়ে করতি এল বর—চার দাঁড়ের নৌকোয় বৌ নিয়ে গেল—তারপর আর কি, শাশুড়ী স্বামীর ঝাঁটা লাথি খেয়ে বৌ চলে এলো বাপের কাছে।

—আহা রে।

—আহারে আবার কি? তুমি তো ঝাড় ফুঁক, মন্তর-তন্তর জানো, বনের বাঘ তোমার কথা শোনে—দ্যাও না একটা তাবিজ, মাদুলি, যাতে ভুঁইঞার জামাই পোষ মানে।

—ও সব মন্তরতন্তরে আজকাল কাজ হয় না রে, এখন যে কলির শেষ।

জঙ্গলের মেজাজটা আচমকা চড়ে যায়। বলে, তুমি কি সত্যযুগের মানুষ নাকি—এখন চারদিকে কলি দ্যাখো। ও সব কলির পাঁঠাদের কি করে জব্দ করতি হয়, সে ওষুধ আমার জানা আছে। বে করা বৌকে ঘরের বার করে দেয়—এ সব পোঙা-পাকামির ওষুধ কি জানো—আচ্ছা করে গো-বেড়ন। কোন্ বাপের ব্যাটা আছে, জঙ্গল পাহাড়ীর কথা যে শোনবে না?

জঙ্গলের চরিত্র বাউলির অজানা নয়। উল্টোপাল্টা কিছু বললে এখনই আরো চটে উঠবে। তাই কথার পিঠে বলে ওঠে, তুই যা না—মেয়েটারে দে আয় স্বামীর ঘরে।

কিন্তু জঙ্গল বললে, না বাউলি আমি যাবো না। আমার কি দরকার। আমার কব্জিতে জোর আছে, সে জোরটা কাজে লাগাতে সবাই ব্যস্ত। ওই শাস্ত ভুঁইঞা, অরে তো আমি চিনি—ও ভাবে টাকায় সব হয়—

কথায় ছেদ পড়ে। ঘর থেকে কামিনী বলে, জঙ্গলিরে তুই মাছের আঁশটা ছাড়িয়ে দে, আমি কেটেকুটে নেবানে।

—ওকি বেটাছেলের কাজ। জঙ্গল বলে, ও তুমি যা হোক করে কেটে কুটে নিও নে। আমি আর আঁশ হাত করতি পারবো না।

—তাই তো বলি, এবারে ঘরে একটা মানুষ নে আয়। কামিনী বলে, তা তো তুই কানে নিবি নে।

—একটা কেন মা, বলো তো পাড়ার সব মানুষ তোমার উঠোনে জড়ো করে দিচ্ছি।

—তোর ওই এক কথা। কামিনী কুঁজোভেটকিটা হাতে তুলে নেয়, বাউলিকে শুনিয়ে বলে, শুনতেছো বাউলি—ওর এই এক রকম ধরন।

বাউলি বলে, খুড়ি—এই আমি বলে যাচ্ছি, যে মেয়ে মানুষের নামে ও দশ হাত পেছিয়ে যায়, দেখবা সেই মেয়ে মানুষের হাতে ও বাঁধা পড়েছে।

বাউলির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল আবার গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে।

সেই মুখেই বৈঠা কাঁধে দ্বিজু এসে দাঁড়ায় উঠোনে। জঙ্গলের রোখটা গিয়ে পড়ে দ্বিজুর ওপর। বলে, মরদ আমার কাম করে এলো, যা দাওয়ার কোণে মাছটা পড়ে আছে, কুটে দে।

দ্বিজু দাওয়ার ওপর উঠে। চোখের সামনে পড়ে আছে কুজো ভেটকি। কান্‌কোর পাশ দিয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তখনো।

অন্ত এবারে একটু মোলায়েম স্বরে বলে, জঙ্গলরে—যে আকাশে সূয্যি জলে, সেই আকাশে চাঁদ জোছনার চামর বুলোয়, আবার সেই আকাশেই রামধনু ওঠে। তোর জীবনটা এখন কাটফাটা রোদ্দুরের মতন—দুদিন পরে দেখবি এই জীবনেই জোছ্‌না ফুটেছে, তারপর দেখবি রামধনুর রঙ তোর জীবনটারে রঙিন করে দেছে।

॥ তিন ॥

ভাঁটার অপেক্ষায় মালোপাড়ার ঘাটের কাছে ডিঙি বেঁধে আরাম করছিল জঙ্গল।

খোলা পাটাতনের ওপর চাটাই বিছিয়ে শুয়েছিল সন্ধ্যের আকাশের দিকে চোখ রেখে।

আকাশটা আজ বড় পরিস্কার। দুপুরের বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। একফালি চাঁদ রয়েছে এক কোণে, আর আকাশ জুড়ে জোনাকির মতো নক্ষত্রেরা জ্বলছে।

সকালে সর্দারপাড়া থেকে গণেশ মোড়লের ধান নিয়ে এসেছিল ছোট মোল্লাখালির হাটে। বেচা-কেনা করে গণেশ মোড়ল টাকার গেঁজে কোমরে বেঁধে লঞ্চে ফিরে গেছে বাড়ি। আর উজান বেয়ে যাবে না বলেই জঙ্গল অপেক্ষা করছে মালোপাড়ার ঘাটে।

ডিঙিতে এখন সে একা। দ্বিজু গেছে হাটখোলায়। মদের বোতল আর খানিকটা ভাজাভুজি আনতে। সকাল থেকে আজ এক রকম নির্জলাই গেছে জঙ্গলের। বাড়িতে ছিটেফোঁটা যা ছিল, তাই দিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়েছিল শুধু।

দ্বিজু ফিরে এলো। গামছায় বাঁধা বেশ খানিকটা মুড়ি আর পেঁয়াজী—আর বগলদাবায় একটা বোতল।

পারে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে দ্বিজু। জঙ্গল উঠে বসলো। ডিঙির মুখটা লগি মেরে ঘুরিয়ে দিতে হবে, নইলে দ্বিজু উঠতে পারবে না।

লগি মেরে ডিঙির মুখটা পারের মাটিতে লাগায় জঙ্গল। দ্বিজু উঠে আসে ডিঙিতে।

দ্বিজুর হাত থেকে বোতলটা প্রায় ছিনিয়ে নেয় জঙ্গল। ঢক ঢক করে করে খানিকটা গলার মধ্যে ঢেলে দেয়। তারপর গামছার পুঁটুলিটা খুলে মুড়ি আর পেঁয়াজী চিবোতে আরম্ভ করে।

দ্বিজুও সামনে বসেছে। জঙ্গলের মতো পাকা নেশাখোর না হলেও মাঝে মাঝে চেখে দ্যাখে। কিন্তু সে জানে জঙ্গল তাকে কিছুতেই বোতল তুলে দেবে না। ও তো জানে, এ ব্যাপারে ওই মানুষটার হাত সরে না।

কি করে একটু পাবে, তারই জন্যে ছুতো খোঁজে দ্বিজু। শেষটা হঠাৎ তার একটা চিন্তা মাথায় এসে যায়। বলে, জানো জঙ্গলিদা—আজ যেন গা-গতরটা কেমন টাটাচ্ছে।

জঙ্গলের মনে তখন রঙ ধরেছে। বোতলটা এগিয়ে দিয়ে বলে, নে না—এক ঢোক খা।

দ্বিজু ইতস্তত করে।

—মুখে ঢেলে দিতে হবে নাকি? নে—বলে বোতলটা এগিয়ে দেয়।—বেশি খাস নে—বেসামাল হয়ে পড়বি।

দ্বিজু বলে, তুমি বললে তাই খাচ্ছি, নয়তো এ সব আমার ভালো লাগে না।

—যা ফিচকেমি করিস নে। জঙ্গল বলে, তা-ও যদি না জানতাম তোর কথা। খাচ্ছিস খা—

দ্বিজু আর কথা বলে না। বোতলের মুখ থেকে আলগোছে খানিকটা মদ ঢেলে দেয় মুখের মধ্যে। তারপর বোতলটা জঙ্গলের হাতে দিয়ে বলে, নেও—আর খাবো না।

বসে বসে বোতলের বাকি পানীয়টুকু শেষ করে ফেললো জঙ্গল। সেই সঙ্গে মুড়ি আর পেঁয়াজীও সাবাড় করলো। তারপর খানিকটা জল খেয়ে আবার ডিঙির পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়লো চিৎ হয়ে। হাত দুটো মাথার নীচে ভাঁজ করে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভরা জোয়ারে টলমল করছে গাঙ। মৃদু বাতাসে সে জলে মৃদু তরঙ্গ উঠছে। জল আছড়ে পড়ছে পারের মাটিতে। মৃদু শব্দ জাগছে। আর আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, জঙ্গলের কখন যেন আবিলি এসে যায় তরঙ্গের মৃদু শব্দ শুনতে শুনতে। আর দ্বিজুও দুইহাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ক্লান্ত শরীরটাকে আরাম দিচ্ছিল।

—ও মাঝি, মাঝি ভাই।

ডাক শুনেই আবিলির ভাবটা কেটে যায় জঙ্গলের। ফিরে চায় গাঙের দিকে। জোয়ার শেষ হয়েছে, ভাঁটার টান লেগেছে গাঙে।

—কি বলো? শুয়ে থেকেই সাড়া দেয় জঙ্গল।

—ভাড়ায় যাবে নাকি?

কথার সুরেই জঙ্গল বুঝতে পারে এ দেশের মানুষ নয়। কথার টান অন্য ধাঁচের।

—না। জঙ্গল জবাব দেয়, বাড়ি যাবো।

—কোন দিকে যাবে? আবার প্রশ্ন আসে ডাঙা থেকে।

—নটবরের ঘাট হয়ে পারঘুমটি।

এবারে উঠে বসে জঙ্গল। ফিরে তাকায় ডাঙার দিকে। পারে আল বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ জন মানুষ। যদিও ভাঙা চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, তবু বুঝতে পারে তিনজন পুরুষ, আর দু'জন মেয়ে মানুষ। কি মনে হয় জঙ্গলের, জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবা তোমরা?

—যাবো নটবরের ঘাট, নিয়ে যাবে?

জঙ্গল কি যেন ভাবে। মন্দ কি। যাবার পথে খালি ডিঙি নিয়ে তো ফিরতেই হতো, এখন যদি ভাড়া জুটে যায়—ভালোই তো। বলে, আছো কজনা?

—পাঁচ জন।

—মাথা পিছু দুটাকা করে লাগবে। জঙ্গল বলে, পুরো দশটা টাকা—দরাদবি কিন্তু চলবে না।

—ঠিক আছে তাই পাবে। পার থেকে কথা ভেসে আসে, ডিঙির মাথাটা মাটিতে লাগাও, নয়তো কাদা ভেঙে উঠবো কি করে?

—এ্যাই দ্বিজু, ঘাপটি মেরে বসে আছিস কেন—ডিঙির মুখটা পারে লাগায়ে দে লগি মেরে দাঁড়া।

কথা মত কাজ করে দ্বিজু। লগি মেরে ডিঙির মাথা মাটিতে লাগালো।

বয়স্ক পুরুষটির গলায় ঝোলানো হারমোনিয়ম, ছোকরা বয়সের পুরুষ দুটির এক জনের হাতে বাঁয়া তবলা, একজনের কাঁধে ঢোলক—মেয়ে দুটির হাতে একটি করে টিনের রঙচঙে স্যুটকেশ। একটি মেয়ে মোটাসোটা, আর একটি শ্যামলা রঙের ছিপছিপে গড়নের।

হালকা চাঁদের আলোয় মানুষগুলোকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না জঙ্গলের—কীর্তন-টির্তনের দলই হবে। কোথাও 'গাওনা' গাইতে চলেছে। মেয়ে দুটির দিকে এক নজরে তাকিয়ে জঙ্গল বোঝে, একটি মেয়ে যেন শীতের গাঙ, আর একটির অঙ্গে অঙ্গে বর্ষাকালের ঝড়-তুফান। মোটাসোটা মেয়েটি বিবাহিত, কপালের সিঁদুর চোখে না পড়লেও হাতের শাঁখা তার নজর এড়ালো না।

ভাঙাচোরা হ্যারিকেনটা ছিল ডোবার এক কোণে, দ্বিজু সেটাকে জ্বাললো। স্তিমিত আলোয় যে যার মতো ডিঙিতে উঠে বসলো, কিন্তু ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি পা বাড়িয়েও পিছিয়ে গেল।

—অ মাঝি, হাতটা একটু ধরো না গো।

জঙ্গলের উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বললে মেয়েটি। জঙ্গল কিন্তু এ কথা শোনার পরেও চুপচাপ বসে থাকে। যেন কথা তার কানেই যায়নি।

মেয়েটি আবার সুর করে বলে, কি গো নায়ের মাঝি—কালা নাকি?

জঙ্গলের সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় কথা শুনে। অথচ মেয়েমানুষকে খামোকা কথা শোনাতে চায় না।

মেয়েটি আবার সুর টেনে বলে, অ মাঝি, তোমার বৈঠা ধরা হাতে আমার নরম হাতটা একটু ধরো না গো—তোমার না' যেমন টলমল করছে, উঠতে গেলেই পড়ে যাবো।

জঙ্গল এবারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটির হাত ধরে। ডিঙিতে উঠেই মেয়েটি পাটাতনের ওপর জাবড়ে বসে পড়ে। বলে, বাপরে হাতটা কি কড়া।

এবারে মোটাসোটা মেয়েটি বলে ওঠে, তোর ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে রাধা। একি যমুনার কেষ্ট মাঝি? নোনা গাঙের মাঝির হাত একটু কড়া হয়। মেয়েমানুষ হলো মোমের পুতুল, আর পুরুষ হলো পাথুরে, তাই না মাঝি?

ডিঙি তখন পার ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে সরে এসেছে। জঙ্গলের মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলেও মুখে কিছু বলে না। মেয়েমানুষের কথায় কথা বলতে তার পৌরুষ বাধে। বলেও না। চুপচাপ বসে থাকে ডিঙির মাথায়। আর তারই সামনে কতকটা আলুথালু ভঙ্গীতে বসে আছে রাধা।

ভাঁটার টানে আপনি ভেসে চলেছে ডিঙি। হাল ধরে বসে আছে দ্বিজু। জলের টানে ডিঙি ভেসে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

সন্ধ্যার গাঙ-দেশ জুড়ে তখন এক বিচিত্র নীরবতা। বর্ষার নোনা গাঙ মাতাল না হলেও উতলা। ছোট ছোট ঢেউগুলো গাঙের বুকে খেলে বেড়াচ্ছে। ডিঙিটা ঢেউ-এর ওঠা-নামার তালে দুলছে।

সন্ধ্যের ভাঙা চাঁদের হারিয়ে যাবার সময় হলো। এখনও আলো দিচ্ছে দূর আকাশ থেকে। সে আলোয় গাঙের জল-রেখা অস্পষ্টতার মধ্যেও স্পষ্ট। এপারে-ওপারে মাটির রেখাও চোখে পড়ছে।

দ্বিতীয় কোনো ডিঙি চোখে পড়ছে না। বিস্তৃত গাঙের বুকের ওপর দিয়ে এই একটি ডিঙিই ভেসে চলেছে। হালে জল কাটার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

অনেক সময় একভাবে বসে থেকে এবারে একটা বিড়ি ধরালো জঙ্গল। জলন্ত দেশলাই কাঠিটা জলে ছুঁড়ে ফেলার মুহূর্তে তার চোখ পড়লো শ্যামলা মেয়েটার ওপর। মেয়েটা টিনের স্যুটকেশে দুহাত ভাঁজ করে তারই ওপর চিবুক রেখে পাটাতনে উপুড় হয়ে শুয়েছে। তার চোখ দুটি গাঙের দিকে। আর পা দুটি ভাঁজ করে পাছার ওপর রেখেছে।

মুহূর্তের আলোর শ্যামলা মেয়ে রাধার মুখ দেখলো জঙ্গল।

জঙ্গলের মনের মধ্যে হঠাৎ-জোয়ারে বান ডাকলো। দুরন্ত সে বান। শান্ত মনের গাঙটা দামাল হলো। হাজার ঢেউ এক সঙ্গে এলোপাতাড়ি ছুটে গেল। আছড়ে পড়লো পারের মাটিতে।

রাধার চোখে যেন যাদু আছে। জঙ্গলের সর্ব-অঙ্গ শিউরে উঠলো।

—এ্যাই রাধা মুখপুড়ি, মোটাসোটা বৌটি একটি ছোকরার পিঠে পিঠ দিয়ে বসেছিল। বিচিত্র ভঙ্গিতে সুর টেনে বলে, অমন করে শুয়ে আছিস কিসের সোহাগে?

রাধা পা দুটি দোলাতে আরম্ভ করে পাছার ওপরে। পায়ে জড়িয়ে রয়েছে বাসি আলতার রেখা। পায়ের কচি আঙুলে আঙুটি। আর রূপোর মল নেমে এসেছে জায়গা ছেড়ে।

যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থেকে রাধা বলে, সোহাগ নয়রে বিন্দে, ভাবছি ভরা জোয়ারে ভেসে যাই।

বিন্দে হেসে লুটিয়ে পড়ে ছোকরাটির কোলের ওপর। বলে, অ মনোহর, কি বলেরে রাধা—এখন তো ভাঁটার টানে ভাসছি—আর ও বলে কিনা ভরা জোয়ারে ভেসে যাবো।

রাধার মুখে পরের কথাটা যেন জড়িয়েই ছিল। বলে, জোয়ারে ফিরে আসবো বলেই তো ভাঁটার টানে যাওয়া। বিন্দে—বর্ষার ভরা গাঙে ভাঁটাই বা কি, আর জোয়ারই বা কি। দেখছিস না, গাঙ কি রকম টলমল করছে।

বিন্দে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে মনোহরের কোলের ওপর। বলে, আমার যে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

রাধা বলে, ঝাঁপ দে না জলে।

—দেই কি করে। মনোহরের থুঁতনি ছুঁয়ে বিন্দে বলে, এই যে কোমরে দড়ি বেঁধে চাঁদ আমার লাটাই ধরে রেখেছে।

আপন রসিকতায় বিন্দে খল খল করে হেসে উঠলো। তার হাসিতে তরঙ্গ। সে তরঙ্গে তার স্থূল দেহটা থর থর করে কাঁপে।

এত কথার মধ্যেও জঙ্গল অচঞ্চল বসে। যেন একটা পাথরে গড়া মূর্তি।

দ্বিজু হাল ধরে বসে, সে কিন্তু এদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ছটফট করছে। কিন্তু জঙ্গলের ভয়ে কিছু বলতে পারছে না।

বিন্দে এবারে দ্বিজুকে নিয়ে পড়ে। বলে, অ ছোকরা মাঝি—একটা গানটান শোনাও না। ভাঁটিয়ালি গান।

দ্বিজু বলে, গান আমার আসে না। তবে শুনতি ভালো লাগে। তোমরা বরং গাও, আমরা শুনি।

বিন্দে বলে, কি গান শুনবে? রঙ্গ-রসের গান?

দ্বিজু বলে, যা হোক গাও।

এবারে রাধাকে ডাক দেয় বিন্দে বলে, অ রাধা—ধর না একটা গান চুপচাপ বসে থাকতে কি ভালো লাগে?

রাধার চোখ ছিল জঙ্গলের ওপরে। মানুষটাকে অবাক চোখে দেখছিল সে। সত্যিই যেন একটা আশ্চর্য মানুষ। সুন্দর কষ্টিপাথরে তৈরী। কিন্তু ও মানুষের মনটা!

বিন্দের কথা কানে যায়নি রাধার। বিন্দে আবার ডাক দেয় রাধার নাম ধরে। বলে, কি রে রাধা—কথা বুঝি কানে যায় না?

—কি বলছো?

—বলবো আবার কি। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না, একটা গান ধর।

রাধা এবারে পাশ ফিরে শোয়। কিন্তু তার চোখ তখনও জঙ্গলের মুখের ওপর। বলে, পাথরের মানুষের আবার কান আছে তো?

—বেশ বলেছিস।

—সত্যি রে বিন্দে, মানুষটা না ক্ষেপে যায়।— রাধা এবারে উঠে বসে। টিনের সুটকেশের ওপর দিয়ে পা দুটি ছড়িয়ে দেয় ডিঙির মলমের দিকে। শাড়ীটা ইচ্ছে করে টেনে দেয় হাঁটুর ওপরে। হাত দুটি পিছন থেকে পাটাতনের ওপর রেখে শরীরটা পিছনে হেলিয়ে দেয়।

রাধা চুপচাপ বসে থাকে গাঙের বুকের দিকে তাকিয়ে। যেখানে তরঙ্গের ওপর চাঁদের প্রতিবিম্ব ভাসছে।

গাঙের বুক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় রাধা। ফিরে চায় চাঁদের দিকে। ও চাঁদের হারিয়ে যাবার সময় হলো।

রাধার কণ্ঠে সুর জাগে। প্রথমে গুন গুন করে সুর ভাঁজে। তারপর সে সুরের সঙ্গে কথা মিশিয়ে দেয়। সুর আর কথা—রাধার কণ্ঠে বাজে গান। রঙের গান। রসের গান।

জঙ্গল ঠায় বসে ডিঙির মাথায়। রাধার গানের সুর তাকেও স্পর্শ করেছে। সে-ও ফিরে তাকিয়েছে রাধার দিকে।

রাধার অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের জল-তরঙ্গ। যে তরঙ্গ জঙ্গলের দৃষ্টি এড়ায় না। তবু সে পাথরের মতো স্থির। কিন্তু তার মনটা? জঙ্গল যেন তার মনকে নতুন করে খুঁজে পেতে চায়।

গানের মধ্যে ডুবে গেছে রাধা নামে মেয়েটি। ভারি মিষ্টি তার কণ্ঠস্বর। খালি গলায় গাইছে—তবু সে গানে সুরের যাদু-স্পর্শ।

পরপর তিনটি গান গেয়ে রাধা থামলো।

বিন্দে বললে, থামলি কেন?

—আর ভালো লাগছে না বিন্দে। রাধা এবারে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো পাটাতনের ওপর। বললে, তুই বল্ না সেই সাত সকালে বেরিয়ে পথে পথে কম ধকল গেছে। দেহটা তো পোড়ামাটি কিংবা পাথর নয়—যন্ত্রের দেহটা কতো আর সইবে বল? এখন কি গান আসে—ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

বিন্দে খিলখিল করে হাসে।

জঙ্গল এখনো স্থির-মূর্তির মতো বসে। সে যেন সব কিছুর বাইরে।

বিন্দে এবারে উঠে আসে। জঙ্গলের মুখোমুখি বসে বলে, কি গো মাঝি, গান আসে না তোমার? গাও না একটা ভাটিয়ালি। গাঙের বুকে বসে ভাটিয়ালি গান—আঃ—

বিন্দে প্রায় ঢলে পড়ে জঙ্গলের গায়ের ওপর। দ্বিজু দেখে শুনে ভয় পায়, এবারে না ক্ষেপে যায় জঙ্গল।

কিন্তু জঙ্গল শান্ত গলায় জবাব দিলে, গান আমি জানি নে।

—তোমার স্যাঙাত জানে না!

—না।

—তবে তুমি কি জানো মাঝি?

আচমকা ডিঙি টালমাটাল করে ওঠে। বেশ চলছিল ডিঙি, কোথাও কিছু নয়, একদিকে টাল খেয়ে যায় ডিঙি—হালের মুখটা ঘুরে যায়। সবাই ভয় পেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে। বিন্দে তো ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরে জঙ্গলকে। কিন্তু জঙ্গল দু'হাতে ঝটকা মেরে বিন্দেকে সরিয়ে দেয়। ঠিক মতো টাল সামলাতে না পারলে জলে পড়ে যেত বিন্দে।

ভয়ংকর ঘোলে পড়ে ডিঙি চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। এই বুঝি কাত হয়ে পড়ে। মানুষগুলো ভয় পেয়ে প্রায় কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য রাধা নামে মেয়েটি। এই বিপদের মুখেও তাকে বলতে শোনা যায়, মাঝি, আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

জঙ্গল তাড়াতাড়ি উঠে দ্বিজুর হাত থেকে হালের মুঠি কেড়ে নিয়ে ডিঙির মুখে সিধে হয়ে দাঁড়ায়। মুখ-চোখের চেহারা বদলে যায় তার। কিন্তু ভয়ের চিহ্ন নেই তার মুখের রেখায়।

শক্ত মুঠোয় হাল ধরে বিপদের বাধা কাটিয়ে ওঠে জঙ্গল। এবারে সে উত্তেজিত হয়। দ্বিজুকে ধমক দিয়ে বলে ওঠে, এত সময় তোর নজর ছিল কোথায়, এত বড়ো ঘোল সামনে—ঠাওর পাসনি?

দ্বিজু জবাব দেয় না। জঙ্গলও আর কথা বাড়ায় না। একটুতে সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। তার কালো পাথরের মতো দেহটা চকচক করছে।

—নে, হাল ধর। দ্বিজুর হাতে হালের মুঠি ধরিয়ে দিয়ে জঙ্গল আবার ডিঙির বিপরীত দিকে এসে বসে।

বয়স্ক পুরুষ, সঙ্গের হারমোনিয়মটা ধরে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। বলে, এখন দেখছি রাতে না বেরোলেই ভালো হতো।

জঙ্গল বলে, ভয় কি—আমি তো আছি।

কথাটা মনের মতো হয়েছে রাধার। তাই তো সে বলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে, অ মাঝি, আবার বলো—ভয় কি, আমি তো আছি। এমন কথা কজন বলতে পারে, এতো দেশ তো ঘুরে বেড়াই—কোথাও তো শুনিনি।

জঙ্গলের কানে যায় রাধার কথা। শোনে এই পর্যন্ত। নয়তো একটি কথাও বলে না সে।

রাধা আবার সুটকেশের ওপর চিবুক রেখে শুয়ে পড়ে। দৃষ্টি তার গাঙের বুকের দিকে।

ভাঁটার দুরন্ত টানে ডিঙি চলেছে ভেসে। চাঁদ ডুবি ডুবি করে কখন যেন হারিয়ে গেছে।

একবার কাছে, দূরে দৃষ্টিপাত করে জঙ্গল। যদিও এপার-ওপারে স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পায় না, তবু অনুমানে বোঝে, সামনেই কুমীরমারির বাঁক। বাঁক পেরোলেই পুঁইজালির গাঙের মুখে গিয়ে পড়বে। তারপর রায়মঙ্গল ধরে কিছুটা উজানে টেনে গেলেই নটবরের ঘাট।

ডিঙির মানুষগুলো চুপচাপ হয়ে গেছে। বিন্দে ঘুমিয়ে পড়েছে মনোহরের কোলে মাথা দিয়ে। বুড়ো মানুষটা হারমোনিয়াম জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েছে। ছোকরা বয়সের আর একজন বসে থেকে ঝিমোচ্ছে। কিন্তু রাধা তেমনি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নোনা গাঙ তার চোখে ধরেছে। তাই অবাক-চোখে দেখার নেশা।

কুমীরমারির বাঁক পেরিয়ে পুঁইজালির গাঙে পড়লো। দুরন্ত এ গাঙ। ঢেউ-এ উথালিপাথালি করছে। ভাঁটার টান যতো বাড়ে, ঢেউ ততো বাড়ে। তারপর উল্টোদিক থেকে বাতাসও দিচ্ছে।

ডিঙি দুলে-দুলে ওঠে। যে কজন ঘুমোচ্ছিল, তাদের ঘুম ভেঙে যায়। মনোহর বলে জঙ্গলকে উদ্দেশ্য করে, ও মাঝি ভাই—তুমি একটু হাল ধরো না।

জঙ্গল জবাব দেয়, ঠিকই তো চলছে।

মনোহর তবুও বলে, নৌকো যে দুলছে।

জঙ্গল বলে, ক্ষ্যাপা গাঙে ডিঙি একটু দোল খাবে না?

রাধা এবারে কথা বলার সুযোগ পায়। বলে, তুমি তো মরেছো মনোহর, নতুন করে মরণের ভয় কি?

মনোহর নয়, কথা বলে বিন্দে, এ নাও জলে ডুববে না রাধা। দেখছিস না—কালাচাঁদ বসে আছে।

জঙ্গলের মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে। বলে, মসকরা রাখো—নয়তো এখুনি পারে নামিয়ে দেবানে। তখন থেকে আমারে নে ঠাট্টা বোটকারা হচ্ছে, তোমরা ভাবো আমি কিছু বুঝিনে!

—আহা রাগ করো কেন? বিন্দে বলে, ওটা আমাদের স্বভাবের দোষ।

—সে কথাডা আর বলবা কি। জঙ্গল বলে, তোমাদের মুখে-চোখে 'লুটিশ' আঁটা—তোমরা কোন জাতের বলে দিতে হয় না।

শুয়েছিল রাধা। উঠে বসে। একান্তে জলছিল হ্যারিকেনটা। তুলে আনে নিজের সামনে। বলে, ছাখো তো মাঝি আমি কোন্ জাতের?

জঙ্গল কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। রাধা মেয়েটা এই রকম একটা কাণ্ড করে বসবে, তা সে ভাবতেই পারেনি।

হ্যারিকেনের স্তিমিত আলো সরাসরি পড়েছে রাধার মুখের ওপর। শ্যামলা মেয়ে রাধা, টানাটানা দুটি চোখ, টিকোলো নাক, সরু চিবুক। চিবুকের নীচে কাটা দাগ। যদিও মাথার চুল এলোমেলো তবু বাঁকা সিঁথিটা হারিয়ে যায়নি। দুই ভ্রুর মাঝখানে জরির টিপ জ্বলছে, আর জ্বলছে নাকচাবির সবুজ পাথরটা। শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে আছে ডিঙির পাটাতনের ওপর। পাতলা ব্লাউজের ওপর নকল সোনার হারটা ছড়িয়ে রয়েছে। জঙ্গলের চোখে রাধার বুকের কাঁচুলির বন্ধনটুকুও স্পষ্ট।

এমন করে কখনো কোনো মেয়েকে দেখেনি জঙ্গল। আর রাধা, সে-ও নিজেকে দেখাতে গিয়ে জঙ্গলকে দেখছে।

গাঙে যদিও ভাঁটার টান, কিন্তু জঙ্গলের রক্তে জোয়ারের বান ডেকেছে। এ বান যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

মাথা নীচু করলো রাধা। আর জঙ্গল ফিরে তাকালো উত্তরে, যেখানে পুঁইজালির গাঙ দুরন্ত রায়মঙ্গলে গিয়ে মিশেছে।

বেশ খানিক সময় উজানে দাঁড় টেনে নটবরের ঘাটে ডিঙি বাঁধলো জঙ্গল। এক নাগাড়ে দাঁড় টেনেছে। তার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরে পড়ছে। ডিঙি বেঁধে কোমরে জড়ানো গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে সে ডাক দিলে দ্বিজুকে।— এ্যাই দ্বিজু এক ঘটি জল দে তো।

ঢক ঢক করে জল খেয়ে তবেই যেন স্বস্তি জঙ্গলের।

ডিঙি বাঁধার পরেও ডিঙির মানুষগুলো চুপ চাপ বসে আছে। জঙ্গল বলে, বসে আছো কেন—এই তো নটবরের ঘাট।

ভাঁটার টানে জল বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে। নামতে হবে এক হাঁটু কাদার ওপর।

কাদার দিকে চেয়ে যেন আঁতকে ওঠে বিন্দে। বলে, এই তোমাদের ঘাটের ছিরি। ঘাট-ই বা কি, আর আঘাটাই বা কি। তাছাড়া নামবো কেমন করে।

—তা'ও কি আমাবে বলে দিতে হবে। জঙ্গল খ্যাঁক করে ওঠে।

মনোহরের পৌরুষে লাগে। পালটা জবাব দেয় সে। বলে, পয়সা দিয়ে ডিঙিতে উঠেছি—নগদ দশটা টাকা।

জঙ্গল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে কিছু বলতে যায়। কিন্তু রাধার চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে হিম হয়ে যায় সে।

বুড়োমানুষটাকে হাত ধরে নামিয়ে দেয় বিজু। কাদা-মাটি ভেঙে কোনমতে হারমোনিয়মটা ঘাড়ে করে ডাঙায় ওঠে সে। তারপর মনোহরের হাত ধরে নামে বিন্দে। দুজনে জড়াজড়ি করে কোনরকমে উঠে যায় ডাঙায়। এবারে আলু-আলু-মাকড়া ছেলেটা রাধার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, কেমন যেন মেয়েলি গলায় বলে, এসো রাধা।

রাধা বলে, তোমার মতন পুরুষের হাত ধরে রাধা নামে না। যাও, নিজেকে সামলে ওপরে ওঠো গে।

কথাটা জঙ্গলের কানে লাগে। আলু-আলু চেহারার ছোকরার দিকে ফিরে তাকায়। কেমন যেন মেয়েলি ধাঁচের চলন বলন। অনেকটা হিজড়েদের মতন। ছোকরা নরম পলির ওপর নামতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কোনো মতে কাঁধে ঝোলানো ঢোলকটা সামলে নিয়েছে।

রাধা খিল খিল করে হাসে। বলে, কি গো গোঁসাই-এর পো, তোমার বাপ মা আবার নাম রেখেছিলো বলরাম। কি আমাদের বলরাম রে!

বলরাম কাদা মাখামাখি অবস্থায় কোনোমতে পারে গিয়ে ওঠে।

এবারে রাধার নামার পালা। হাঁটুর ওপর শাড়ী তুলে ডিঙির মাথা ধরে কাদায় নামবে বলে রাধা তৈরী হয়, হঠাৎ জঙ্গলের মনে হয়, আহা, মেয়েটার অমন সুন্দর আলতা রাঙা পা দুখানি কাদা মাখামাখি হয়ে যাবে! রুপোর মল জোড়া রঙ হারাবে কাদায়!

রাধা নামতে যাবে এমন সময় জঙ্গল বলে, ও গো মেয়ে তুমি নামতি পারবা না। দাঁড়াও।

কাদার ওপর লাফিয়ে নেমে পড়ে জঙ্গল। দুটো হাত বাড়িয়ে দেয়। বলে, এসো, তোমারে আমি ডাঙায় তুলে দেই আড়কোলা করে।

রাধা আপত্তি করে না। জঙ্গলই তাকে দু'হাতে টেনে নেয়। শক্ত মানুষ জঙ্গল, কতকটা আলগোছে তুলে নেয়ার মতন, তার বলিষ্ঠ দু'হাতের তেলোর ওপর তুলে নেয় রাধার হালকা আর পাখীর মতন নরম দেহটা।

পারে দাঁড়িয়ে বিন্দে হেসে লুটিয়ে পড়ে। আর মনোহর তখন নিতান্ত বেহায়ার মতো বিন্দের দু'কাঁধে হাত রেখে বলছে, শেষটা সরমের মাথা খেয়ে বসলে রাধা?

রাধাকে পারের মাটিতে নামিয়ে দিয়ে জঙ্গল বুড়ো মানুষটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। বলে, দ্যাও—ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দ্যাও।

—এর পরেও ভাড়ার টাকা। বিন্দে বলে, রাধার অঙ্গের পরশ পেলে, তার কি দাম দেবে গো মাঝি?

—চাইনে ভাড়া। তোমাদের টাকায় আমি থু থু দেই। বলেই জঙ্গল নরম পলির ওপর পা ফেলে নেমে আসতে যায়। কিন্তু বাধা দেয় রাধা। বলে, দাঁড়াও মাঝি—টাকা নিয়ে যাও।

বুড়ো মানুষটা নয়, আঁচল থেকে টাকা খুলে দেয় রাধা। বলে, দুটো টাকা বেশী আছে—তোমরা মিষ্টি কিনে খেয়ো।

জঙ্গল অবাক চোখে চেয়ে থাকে। রাধা বলে, আমারই এ দল। ময়নাডালে আমাদের ঘর। এ দলের নাম—রাধা বোস্টুমীর দল।

—কোথায় যাচ্ছো তোমরা?

—যোগেশগঞ্জে বাসুদেব মণ্ডলের বাড়ি। তার মায়ের শ্রাদ্ধে তিনরাত কীর্তন হবে—তাই যাচ্ছি। আসার কথা ছিল দিনে দিনে—কিন্তু লঞ্চ ধরতে পারিনি, তাই তো তোমাদের ডিঙিতে আসা।

পারে ভেড়ির ওপর দাঁড়িয়ে চার দিকে চোখ বুলিয়ে নেয় রাধা। ঘুরঘুটি অন্ধকার। দূরের কিছুই দেখা যায় না।

জঙ্গল বলে, এই আঁধারে যোগেশগঞ্জে যাবা কি করে? তারপর ভেড়িপথে কাদার ওপর চলতে তো পা হড়কে জোলে পড়ে যাবা। সঙ্গে আলো আছে?

রাধা বলে, আলো তো ছিল। যে পুঁটুলিতে ছিল, সে যে তোমাদের হাসানাবাদ লাইনের গাড়ীতেই হাত সাফাই করে কে নিয়ে গেছে।

—তা তো বোঝলাম। জঙ্গল বলে, তোমরা 'রঙ্গদেরে' কীত্যনে—রঙ তামাশায় মেতে থাকবা, তা পোঁটলার দিকে নজর রাখবা কি করে। যাক গে, এখন যাবা কি করে? চলো—তোমাদের পৌঁছে দে আসি।

বিন্দে সুর করে বলে, তোর কালো হরিণ চোখের গুণ আছে রাধা—অ মাঝি সত্যি তুমি রক্ত মাংসের মানুষ—পাথর নও।

এ সব কথা কানে নেয় না জঙ্গল। কাদার মধ্যে নেমে ডিঙিতে যায়। পাঁচ ব্যাটারীর টর্চটা নিয়ে আসে। দ্বিজুকে বলে এখানে ডিঙি নিয়ে অপেক্ষা করতে।

কিন্তু এই ঘাটে একা থাকতে দ্বিজুর ভয়। এই মাঝ রাতের অন্ধকারে, ডিঙি নিয়ে এখানে অপেক্ষা করা মানে যমের দোরে বসে থাকা, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছে না।

পাঁচ ব্যাটারীর টর্চটা জেলে ওপরে উঠে আসে জঙ্গল। আলো একবার রাধার মুখের ওপর পড়তেই জঙ্গলের চোখে তার রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণে আলোর বৃত্তটা ফিরিয়ে নেয় মাটির ওপর।

পারে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো চারদিকে ঘুরিয়ে নেয় জঙ্গল। চারদিকের মাঠে জল। মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে আছে ভেড়ি।

রাধা বলে, কতদূর যেতে হবে মাঝি?

জঙ্গল টর্চের আলোটা সামনের দিকে ফেলে। বলে, অনেক দূর—এ আলো ততো দূর পৌঁছয় না।

ভেড়ি পথ ধরে রাধা বোস্টুমীর কীর্তনের দলকে নিয়ে যোগেশগঞ্জের দিকে চলে জঙ্গল।

সেই রাতে বাসুদেব মণ্ডলের বাড়ি কীর্তনীয়ার দলকে পৌঁছে দিয়ে আবার নটবরের ঘাটে ফিরে এলো জঙ্গল।

দ্বিজু ডিঙির কোণে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। এতো সময় ধরে ভয়ে রাম নামই জপ করেছে সে। বার বার তার মনে পড়ছিল মায়ের কথা। মায়ের সেই নড়বড়ে দেহটা ঝুলছিল ঘরের আড়ায়—সেই ছবিটাই দ্বিজুকে হিম করে দিয়েছিল।

ভাঁটার টান শেষ হয়েছে। এবারে জোয়ারে ডিঙি ভাসিয়ে পারঘুমটির দিকে যাবে।

দ্বিজু হাল ধরে বসেছে। দাঁড় টানার দরকার ছিল না—তবু দুহাতে দাঁড় টানতে আরম্ভ করে জঙ্গল।

ডিঙি তীরের মতো ছুটে চলে মাঝদরিয়া বরাবর। জঙ্গলের সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরে পড়ে। দৃষ্টি তার যদিও গাঙের দিকে, তবু সে চোখে রাধার মুখটা ভাসছে।

বাসুদেব মোড়লের উঠোনে দাঁড়িয়ে বলেছিল রাধা, এ দেশে এসে একজন মানুষ দেখে গেলাম মাঝি—সে মানুষ তুমি।

॥ চার ॥

এখনো জঙ্গলের আশ্রয়েই আছে বনবিবির চেলা অন্ত বাউলি। কদিন নিয়মে থেকে অন্ত তার ভাঙা শরীরেও জুৎ পেয়েছে। যদিও পাওয়া না-পাওয়া সমান। সে মনে মনে ঠিকই জানে, তার ঘুণ ধরা শরীরে আর যৌবন ফিরে আসবে না। এখন শুধু ভাঁটার টানে ভেসে যাওয়া। গাঙের মতন জীবনটা মরণ-সাগরে গিয়ে মিলতে যে কদিন। সাগরে মিললেই তো সব ফুরিয়ে গেল।

অন্ত'র মনের ইচ্ছের বাতিগুলো কিন্তু ঠিকই জ্বলছে। শরীরটা তার ঘুণ ধরে নড়বড়ে হয়ে গেছে, কিন্তু মনের দিক থেকে এখনো চাঙ্গা। এখনো এক জায়গায় বসে এক কলকে গাঁজা দমে দমে সাবাড় করে দেয়, এখনো মাথার তেলোয় ভিজে গামছা দিয়ে দু' পাঁচ মাইল পথ হেঁটে এর ওর বাড়ির খবর নিয়ে আসে। শরীর তার বয় না, মন তাকে ঠিকই টেনে নিয়ে যায়।

দুটি চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, তবু অন্ত'র চোখের নজর ঠিকই আছে। থাকার মধ্যে আছে মন আর ওই চোখ দুটো। ওর চোখ দুটো যেন জোনাকির মতো জ্বলে। ও চোখের দিকে কেউ-ই চেয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু জঙ্গল অনায়াসে অন্ত'র চোখে চোখ রাখতে পারে। অন্ত'র যদিও পলক পড়ে, কিন্তু জঙ্গলের চোখের পাতা নড়ে না।

তাইতেই তো সেবারে অন্ত বলেছিল, যাবার আগে আমি তোর হাতে বনবিবির ডোর বেঁধে দে যাবো জঙ্গল। তোর দেহে অসুরের বল আছে, মনটা মজবুত, আর তোর চোখ দুটো বাবা দক্ষিণ রায়ের চোখের মতন— আমার পর তুই।

'মউলেরা' বলেছিল, তাই হবে। জঙ্গলকে আমরা বাউলি বলে মান্যি করবো।

কিন্তু জঙ্গল বলেছিল, সবই তো বোঝলাম, কিন্তু তোমার ওই মন্তরতন্তর ঝাড়ফুঁক আমি মানি নে।

অন্ত শিউরে উঠেছিল। বলেছিল, ও কথা বলিস নে—তোর জিব খসে যাবে।

অঙ্গল বলেছিল, এই তো বললাম, জিব তো খসলো না। বাউলি, তোমারে আমি মানি, তোমার মন্তরতন্তর মানিনে।

অন্ত আর কথা বাড়ায়নি সেদিন। শুধু বলেছিল, আমি তোরেই চিনি অঙ্গল। তুই যাই বলিস না কেন, তোর মনের মধ্যে কু নেই। অনেক দিন কাটলো এ দেশে, অনেক মানুষ দ্যাখলাম—তার মধ্যে মনের মতন একজনকে খুঁজে পেইচি—সে হলো গে তুই। তুই মরদের ব্যাটা মরদ।

সকালে উঠেই পুকুরে ডুব দিয়ে এলো অন্ত। কালাপেড়ে কোরা ধুতি ছিল ঝুলিতে, সেটি বার করে পরিপাটি করে পরলো। মাথার কাঁচা পাকা চুলগুলো মাঝখানে সিঁথি কেটে মাথার দুপাশে ফিরিয়ে দিলে। মান্ধাতার আমলের একটা ফতুয়া ছিল সিল্কের, পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে—সেটি গায়ে চাপালো। তারপর নানা রকমের মালাগুলি ফতুয়ার ওপর গলায় ঝুলিয়ে জলচৌকির ওপর বসে 'খুড়ি' বলে ডাক দিলে সুমণিকে।

সুমণি চৌকাঠের এপারে এসে বললে, কি বলতেছো?

—একটু গুড় আর জল দাও।

সুমণি চেয়ে দেখে বাউলিকে। বলে, যাবা কোথায় এতো সাজগোছ করে?

—যোগেশগঞ্জে বাসুদেব মোড়লের বাড়ি। জাঁক করে মায়ের ছেরাদ্দ করতেছে বাসুদেব—সেদিনে হাটখোলায় দেখা হইছিল বাসুদেবের সঙ্গে—অনেক করে বলে দেছে আমারে যাতি। বলেছে, নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত আমারে ওখানে থাকতি হবে। কিন্তু অঙ্গলকে এখনো বলা হয়নি কথাটা। সে কি এখনো ঘুমোচ্ছে?

—হ্যাঁ, এখনো অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েচে। শেষ রাতে বাড়ি ফিরেছে ছাইপাঁশ গিলে—ওর ঘুম কি এখুনি ভাঙবে।

—ও উঠুক, তারপর যাবানে। তুমি ততক্ষণ একটু গুড়-জল দ্যাও, পিত্তি ঠাণ্ডা করে বসি।

একদলা ভেলিগুড় আর এক ঘটি জল এনে সুমণি রাখে অন্তর সামনে। গুড় জল খেয়ে ঝুলি থেকে গাঁজার কৌটো বার করে অন্ত। এক ছিলিম গাঁজা না চড়ালে শরীরটা চাঙ্গা হচ্ছে না।

হাতের তেলোয় গাঁজা নিয়ে থু থু ছিটিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে দলা পাকায়। তারপর কলকেয় ভরে নারকেল দড়ির আগুন জেলে দেয় কলকের মাথায়।

ন্যাকড়া ভিজিয়ে কলকের তলায় দিয়ে দমভোর টান দেয়। বেশ খানিক সময় ধোঁয়া পেটের মধ্যে রেখে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বার করে দেয়।

গাঁজার ধোঁয়া গেলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত-র চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে। ঘটিতে সামান্য জল ছিল, সেটুকু আবার গলার মধ্যে ঢেলে দেয় অন্ত। পর পর দুবার কলকের টান দিতে দমকা কাশি আসে। হাত থেকে ছিটকে পড়ে কল্কেটা। দুহাত বুকে চেপে ধরেও কাশির ধমক সামলাতে পারে না। কাশতে কাশতে দলা দলা সর্দি ওঠে। শেষটা সর্দির সঙ্গে রক্ত। চৌকির ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে অন্ত। কাশির ধমক যদিও কমেছে, কিন্তু হাপর টানার মতো শ্বাস টানতে আরম্ভ করে।

জঙ্গলের ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে এসেছে ঘুম চোখে। বাউলির অবস্থা দেখেই চমকে ওঠে। সর্দি আর রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তারপর গাঁজার কলকেটা। জঙ্গল দেখেশুনে ভয় পায়। বাউলির মাথাটা অদ্ভুত ভাবে ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর।

এগিয়ে যায় জঙ্গল। মাথা হেঁট করে বাউলির মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে। তারপর একটা হাত দিয়ে বাউলির মাথাটা তুলে ধরে। বাউলির গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। রক্ত জবার মতো চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

—কি হলো তোমার? সাতসকালে জামাই সেজে গাঁজা ফুঁকতে বসেছো? জঙ্গল জিজ্ঞাসা করে, এই নেশার মায়াটা এখনো তুমি ছাড়তে পারছো না?

অন্ত ফ্যাসফেঁসে গলায় বলে, ওই কলকেটার মধ্যে আমার জীবন।

—তোমার জীবন যাবে ওই নেশায়। বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, এখন আর ও সব কেন। এ সব ছাড়ান দ্যাও বাউলি। নয়তো বেঘোরে পরাণডা যাবে।

—পরাণ তো গামছায় বেঁধে রাখার সামিগ্রি নয়—যে করেই হোক ওটা যাবে।

অন্ত অনেকখানি সামলে নিয়েছে নিজেকে। সোজা হয়ে বসেছে। সর্দির দলাগুলো নিজের হাতে গামছায় মুছে নিয়ে বলে, একটু জল এনে দে, জায়গাটা পোসকার করে দেই। খারাপ ব্যামো—

জঙ্গলের ওই এক কাণ্ড, একটা ঘটি করে জল আনলে চলতো, তা নয়—মেটে কলসি ভরে জল এনে হাতনের ওপর ঢেলে দিলে। অন্ত বলে, সব তাতেই তোর আকালকেঁড়ে ব্যাপার। কি করলি বলতো!

—ওই যে বললে খারাপ ব্যামো—ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাক। জঙ্গল বলে, কথায় কথায় খারাপ ব্যামোর কথা বলো কেন?

—কেন যে বলি, তা তুই বুঝবি নে। অস্ত বলে, এ ব্যামো যেন আর কারো না হয়।

উঠে দাঁড়ায় অস্ত। ভাঙাচোরা ছাতাটা ছিল চালের বাতায়, সেটা পেড়ে বগলদাবায় নেয়। মান্ধাতার আমলের বাঁশের লাঠিটা হাতে নিয়ে বলে, যোগেশগঞ্জে যাচ্ছিরে জঙ্গল। তিনটে দিন বাসুদেব মোড়লের বাড়িতেই থাকবো।

—হঠাৎ বাসুদেবের বাড়ি? ছেরাদ্দর নেমন্তন দেছে তোমারে?

—তা না দিলে কি আর অস্ত বাউলি যায়। ঝাঁটা লাথি খেয়ে তোর দোর গড়ায় পড়ে থাকতি পারি, তাই বলে বিনা নেমন্তন্নে বাসুদেব মোড়লের বাড়ি যাতি পারিনে। হ্যাঁরে, তোরে বলেনি বাসুদেব?

—আমারে? জঙ্গল বলে, আমারে বলবে বাসুদেব! জানো না, মেছো ঘেরি নে ওরে আমি টাইট দিছিলাম। মনে নেই—

কথা শেষ করতে পারলো না জঙ্গল। সামনেই উঠোনে পা দিয়েছে বাসুদেবের ছোট ভাই শুকদেব।

যতই বেপরোয়া হোক, কখনো আসলে ভুল করেনা জঙ্গল। শুকদেব এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে। ন্যাড়া মাথা, গলায় কাছা। জঙ্গল তাড়াতাড়ি একটা জলচৌকি এনে বসিয়ে দেয় দাওয়ার কোণে। বলে, বোসো ছোট মোড়ল।

শুকদেব বলে, এখন আর বসবো না জঙ্গল। মা'র কাজ আজ। কাল আসি-আসি করেও আসতে পারিনি। তাই আজ সকালে আসতে হলো।

—এয়েচো যখন একটু বসে যাও।

না বসে পারে না শুকদেব। বলে, তোমার কিন্তু যাতি হবে জঙ্গল। যাবা তো?

—এয়েচো যখন, মান রাখতি যাতি হবে বৈকি।

—শুধু যাওয়া নয়—দেখে শুনে সব করে-কর্মে নিতে হবে।

—তা হবে বৈকি। অস্ত বলে, 'বিরদ' কাজ বলে কথা। তোমার দাদার মুখে শোনলাম তিন চার হাজার লোকের পাত পড়বে আজ। শোনলাম, ময়নাডাঙ্গের কোন্ এক বোস্টুমীর দল আসছে কেত্যন গাইতে!

শুকদেব বলে, এটা দাদার ইচ্ছে—মা আমাদের কেত্যন শুনতি

ভালোবাসতেন। আমার দাদামশায় তো এক সময় কেত্যনের দলে ছিল। দাদামশায়ের কেত্যন আমরাও শুনিচি।

বসার সময় নেই শুকদেবের। জঙ্গলকে সকাল করে যাওয়ার কথা বলে উঠে দাঁড়ায়।

মড়ির খালে ডিঙি বাঁধা আছে শুকদেবের। শুনে অশ্ব বলে, চলো ছোট মোড়ল, তোমার সঙ্গেই চলে যাই।

—এসো। শুকদেব বলে, তুমি গুনীন মানুষ—তোমারে সঙ্গে নে যাই। জঙ্গল কি এখন আসবা নাকি?

জঙ্গল বলে, আমি পরে যাবানে। তোমরা যাও।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল আপন মনে মৃদু শব্দ করে হাসে। সেই মুহূর্তে তার মনে পড়েছে, গত রাতে যখন বাসুদেব মোড়লের বাড়ির উঠোনে রাধার দলকে পৌছে দেয়, তখন বাইরের ত্রিপলের ছাটনীর নীচে ভিয়েন হচ্ছিল। দু-দুটো হ্যাজাক জ্বলছিল সেখানে। দেখেছিল বাসুদেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে। আর বাসুদেবও নিশ্চয়ই তাকে দেখেছিল। আর সেই জন্যেই মতলববাজ বাসুদেব আজ ভোরে শুকদেবকে পাঠিয়েছে। জঙ্গল বেশ ভালো করেই বোঝে, এই মওকায় তার সঙ্গে পীরিত জমাতে চায় বাসুদেব।

অনেকদিন পর আজ গায়ে মাথায় সাবান দিলে জঙ্গল। তারপর শুকনো গায়ে, মাথার চুলে তেলের হাত বুলিয়ে আর এক দফা স্নান করলে।

ক্ষারে কাচা নীল মাড় দেওয়া কাপড় আর হাফসার্ট বার করে পরলো জঙ্গল। জুতো জোড়া পায়ে দেওয়া হয় না—আড়ায় ঝোলানো ছিল, কিন্তু পায়ে দিতে গিয়েই হলো মুস্কিল। শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। জলে ভিজিয়ে তবে পায়ে ঢোকাতে পারলো। গোবিন্দকাটির হাটখোলায় একজন মুচি বসে, যাবার সময় তো ওই পথেই যাবে, কয়েকটা পয়সা দিয়ে জুতো জোড়ায় রঙ করে নেবে।

জামা কাপড় পরার পর এবারে চুল আঁচড়ানোর পালা। ঘাড় অব্দি লুটিয়ে পড়া কালো কোঁকড়া চুল সাবান মাথার পর ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। তেলের হাত বুলোনোর পরেও চুল যেন এখনো ফুলে ফেঁপে আছে। চিরুনি দিয়ে চুলগুলো পিছন দিকে ফিরিয়ে দিলে। গোঁফের কানি পাকিয়ে তুলে দেওয়াটা ওর অভ্যেস। কিন্তু খোঁচা খোঁচা দাড়িটা কামিয়ে নিতে পারলে ভালো হতো। হাটখোলার পাশেই হাজু নাপ্‌তের বাড়ি—কামিয়ে নিলেই হবে।

সাজগোছ করে বেরোবার মুখে সুমণি এসে দাঁড়ালো।—যাচ্ছিস যা, দেখিস যেন কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিস নে।

জঙ্গল বলে, তোমার কথা মনে থাকবে। আচ্ছা মা, আমারে কেমন দেখাচ্ছে বলো দিকিনি ?

ছেলের মুখে কখনো এ ধরনের কথা শোনেনি সুমণি। শুনে একটু অবাক হয়।

—কথা কও না যে ?

সুমণি কথা বলবে কি, নিজের ছেলেকেই সে অবাক চোখে দেখছে। হোক না তার গায়ের রঙ কালো, কিন্তু অমন গড়ন পেটন, এ তল্লাটে কোন্ মায়ের ছেলের আছে। অমন চোখ-মুখ, অমন দশাসই চেহারা—সব মিলিয়ে মহাদেব ঠাকুরের মতো।

চেয়ে থাকতেই সুমণির বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে। ছেলের দিকে অমন নজর দিতে নেই। নিজের কড়ে আঙুলটা দাঁতে কামড়ে মাটিতে থুথু ছিটিয়ে দেয়। নজর লাগে না এতে। দোষ কেটে যায়।

কি মনে হয় জঙ্গলের। মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নেয়। বলে, তোমার এ ছেলেটা বেজায় দুষ্টু, না ?

সুমণি বলে, বেশী রাত করিস নে। আর একটা কথা মনে রাখিস, নেশাভাঙ করে ছেরাদ্দ বাড়িতে যাস নে যেন।

জঙ্গল বলে, আজ আমি শান্ত হয়ে থাকবো মা। তোমারে কথা দে যাচ্ছি। তবে ফিরতি রাত হলেও ভাববা না। বুঝলে ?

জঙ্গল চলে যাবার পরেও সুমণি দাওয়ার ওপর খানিক দাঁড়িয়ে রইলো।

মড়ির খালপারের ভেড়া ধরে হাঁটা পথেই যোগেশগঞ্জের মোড়লবাড়িতে এসে পৌঁছলো জঙ্গল।

মোড়লবাড়ির ভিতর বাইরে লোক গিস গিস করছে। রীতিমতো জম-জমাট ব্যাপার। 'বেরোশ' করেছে বাসুদেব। আশপাশের পাঁচ সাতখানা গাঁয়ের মাথা-মাথা মানুষ নিমন্ত্রণ পেয়েছে। এ-ছাড়া গাঁয়ের মানুষ তো আছেই।

উঠোন জুড়ে চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। নীচে গাঁয়ের হাইস্কুলের যত চেয়ার বেঞ্চি পাতা। তাছাড়া খড়ের ওপর ত্রিপল শতরঞ্চি বিছানো রয়েছে।

একান্তে বৃষকাষ্ঠ পোঁতা। পাশে বামুন ঠাকুরেরা শ্রাদ্ধের কাজ করছে। একদল বৈষ্ণব খোল করতাল নিয়ে মোড়লবাড়ির বারান্দায় হরিনাম কীর্তন করছে।

জঙ্গল মোড়ল বাড়ির উঠোনে পা দিতেই বাসুদেবের ফড়ে গজেন ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত এগিয়ে এলো।—আরে এসো এসো জঙ্গল ভায়া।

—এইচি যখন আবার এসো এসো কেন। জঙ্গল একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। এক সঙ্গে অনেকগুলি চোখ তার ওপর এসে পড়েছে।

গজেন একটা চেয়ার দেখিয়ে বলে, ওইখানে বোসো জঙ্গল ভায়া।

—আমাদের কি চেয়ারে বসা মানায়। জঙ্গল বলে, আমি ঠিক জায়গা দেখে বসবানে। তুমি বরং কাজে যাও।

যেদিকে ভিড় কম, সেদিকে একটা বেঞ্চির কোণে গিয়ে বসে জঙ্গল। পাশে জন কয়েক চ্যাংড়া ছোকরা গুলতানি করছিল, জঙ্গল এসে বসতে ছোকরাগুলো চুপ করে যায়।

জঙ্গলের চোখ চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। সেই শ্যামলা মেয়ে রাধাকে দেখতে চাইছে সে। বড় ইচ্ছে কাল রাতে দেখা সেই মুখ আজ দিনের আলোয় দেখবে।

কিন্তু চারদিক খুঁজেও সে মুখ দেখতে পেল না জঙ্গল। ভাবলো, হয়তো তারা মোড়লবাড়ির কোনো ঘরে বিশ্রাম করছে।

হঠাৎ জঙ্গলের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। রাঙাবেলিয়ার শয়তান জীবন ঢালিও এসেছে মোড়লবাড়িতে। ও শয়তানটা এখানে কেন! জঙ্গল দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। ও ঘুঘু শয়তানটার দিকে তাকালেই তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

একবার মনে ভাবলো জঙ্গল, এখানে তার না থাকাটাই ভালো। আবার চলে যাওয়াটাও ভালো দেখায় না। মতলববাজ বাসুদেবের মনে যাই থাকুক, সে কেন ধরা দেবে তাদের কাছে।

এদিক-সেদিক ঘুরে গজেন আবার এলো জঙ্গলের কাছে। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করে এগিয়ে দিয়ে বললে, নেও—সিগারেট টানো।

—সিগারেট! তা দেচ্ছ দ্যাও। জঙ্গল একটা সিগারেট হাতে নিয়ে বলে, বিড়ি টানা মুখে এ সব শানায় না।

গজেন এবারে জঙ্গলের কানের কাছে মুখ এনে বলে, বলো তো অন্য জিনিসও আছে। কড়া মাল। তোমাদের হিমে সা'র পাইল করা মাল নয়—সাহেবখালির মাল।

—না, ছেরাদ্দ বাড়িতে এসে ও সব চলবে না। মরা মানুষের পরানে কষ্ট লাগবে।

—দ্বত্তোর, গজেন বলে, মা'রে পোড়াতি গে বাসুদেব নিজেই মাল টেনেছে।

—বাসুদেব মোড়ল আর জঙ্গল পাহাড়ীর মধ্যে অনেক ফারাক। সে হলো গে মোড়ল আর আমি হলাম খেটেখাওয়া মনিষ্যি। যাক গে—ও সব কথা বাদ দ্যাও।

গজেন এবারে জঙ্গলের পাশে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, রাধা বোস্টুমীরে তো দেখেছো—শোনলাম কেন, চোখেই সে দ্যাখলাম, তুমিই কাল রাত দুপুরে তাদের এই উঠোনে পৌঁছে দিলে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছেটা কি ? জঙ্গলের গলার স্বরটা হঠাৎ যেন একটু চড়ে ওঠে। গজেনের কথায় ঢঙ তার ভালো লাগে না। তাছাড়া লোকটার 'চরিত্তির' তার অজানা নয়—বাসুদেবের ফড়ে, স্বভাবটাও ফিচেল মেয়েমানুষের মতো।

গজেনও বুঝতে পারে, কথাটা ভালো ভাবে নেয়নি জঙ্গল। কিন্তু বলা কথা তো ফিরিয়ে নেয়া যায় না। আর বলেই যখন ফেলেছে, তখন প্রসঙ্গটা শেষ না করেও পারে না। কিন্তু যা বলতে চেয়েছিল, সে ধার দিয়েও যায় না। বলে, মেয়েটা নাকি নাম করা 'কীত্যনে'। আজ সাঁঝ বেলায় সে মাথুর গাইবে। শোনবা তো ?

—যদি সেই এস্তক থাকি, শোনবো। জঙ্গল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তোমরা তো বোঝো আমার অবস্থা। লোক-লোকুতো করতি গেলে আমাদের দিন চলে না। তাছাড়া ভালোও লাগে না এ সব। শুকদেব আজ সকালে নিজে গেল, তাই এ্যালাম। নয়তো আমার কথাটা তো তাদের আগে মনে পড়েনি।

গজেন বলে, বড়ো মানুষের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা।

জঙ্গলের মনের মধ্যে একটু খোঁচা লাগে। গজেন তার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে চাইছে, হয়তো কোনো মতলব থাকতে পারে। এ সব ফড়ে ফেরেববাজ লোককে বিশ্বাস নেই। বলে, ও সব কথা বাদ দ্যাও। কাজের দিনে মন খোলোসা করে থাকতি হয়।

গজেন আর বসে থাকে না। কাজ আছে বলে উঠে পড়ে। জঙ্গল সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেই আগুনেই বিড়ি ধরায়। আর এদিক ওদিক ফিরে তাকায়। রাধা বোস্টুমীকে দেখার ইচ্ছাটা যেন পেয়ে বসেছে তাকে।

শ্যামলা রঙের মেয়ে রাধা। ছিপছিপে গড়ন যদিও, তবু তার অঙ্গ জুড়ে যৌবনের জল-তরঙ্গ। তার পাখীর মতো নরম হালকা দেহটাকে ডিঙি থেকে ডাঙায় তুলে দিয়েছিল জঙ্গল—রাধার 'পরশ' এক অজানা আনন্দের আমেজ এনে দিয়েছিল তার মনে। যে আমেজ এখনো নেশার মতো জড়িয়ে আছে তার মনের আনাচে কানাচে।

মোড়লবাড়ির মানুষের ভিড়ে জঙ্গলের দু চোখ রাধাকে খুঁজে পেতে চাইছে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে দুপুর হলো। বামুন-বোস্টুমের ফলারের পালা মিটতে তারপর উঠোন জোড়া চাঁদোয়ার নীচে পাত পাতা হলো। একই সঙ্গে শ' চারেক মানুষ বসলো লাইন বেঁধে।

বাসুদেব আর শুকদেব—দুই ভাই এবং ওদের ঘর-জামাই সুধন্য হাত জোড় করে জনে জনে বসতে অনুরোধ করলে।

জঙ্গলের কাছে এলো বাসুদেব। বললে, তুমি বসলে না?

- না, পরে বসবানে। জঙ্গল বললে, আমি তো কাছের লোক। যারা দূরে যাবে—তারা আগে বসুক।

বাসুদেব বললে, তোমার কিন্তু যাওয়া চলবে না, সন্ধ্যের পর কেত্তন হবে, শুনে তারপর যাবা।

জঙ্গল বললে, পারি তো থাকবানে। তবে থাকতি পারবো বলে মনে হয় না।

—আমার কথাটা রেখো, শুধু আজ নয়, আজ, কাল, পরশু তোমারে থাকতে হবে এখেনে। যদি নেহাৎ বাড়ি যাবার ইচ্ছে হয়, রাতের দিকে যাবা।

—আচ্ছা, যা হোক হবে।

-- কিছু মনে কোরো না, একটু নিজের মতন দেখে শুনে নিও।

বাসুদেব চলে গেল। চুপ চাপ বসে না থেকে জঙ্গলও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে তদারকি করতে লাগলো।

—কি রে জংলী তুই এইছিস? অন্ত বাউলি পিছনে এসে দাঁড়ায়। পরনের ধোয়া থান ধুতি, গলায় নতুন উড়ুনি দেখিয়ে বলে, বাসুদেব দেছে। আবার নগদ দশটা টাকা।

—তবে আর কি। জঙ্গল বলে, বাসুদেব মোড়ল দেখছি মায়ের ছেরাদ্দে একেবারে মোচ্ছব লাগিয়ে দেছে।

—মোচ্ছব বলে মোচ্ছব। অন্ত বলে, এমন জমকালো কাজ এ তল্লাটে হাল আমলে আর কেডা করেছে।

জঙ্গল বলে, হ্যাঁ, সে তো চোখে দেখতিছি।

অন্ত আর দাঁড়ায় না। ব্যস্ত মানুষের ভিড়ে সেও একজন ব্যস্ত মানুষ। হাড় জিরজিরে দেহটা নিয়ে, তালপাতার সেপাই-এর মতন এদিক ওদিক ঘুরে তদারকি আরম্ভ করলো।

জঙ্গল যতই রোখা মানুষ হোক, সময় বিশেষে শান্ত হতে জানে। আর এমনিতে তো তার স্বভাবটা শান্ত। যদিও বদ্‌মেজাজী তবু কারণ না ঘটলে মাথা গরম করে না।

এদিক-ওদিক ঘুরছে জঙ্গল। অধিকাংশ মানুষ চেনাজানা। কথা বলছে সকলের সঙ্গে। আর জঙ্গলকে তো অনেকেই 'মান্যি' করে।

এক সময় জীবন ঢালির মুখোমুখি হলো জঙ্গল। স্যাঙাতদের নিয়ে খেতে বসেছে জীবন। জঙ্গল সামনে এসে দাঁড়াতেই জীবন সোজা হয়ে বসে।

জঙ্গলও থমকে দাঁড়ায়। ভাবে, জীবনের সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু কথা বলতে মন চায় না, আর কথা না বলাও ভালো দেখায় না। যেখানে সবার সঙ্গেই কথা বলছে।

লুচি ছিল না বললেই হয় জীবনের পাতে। এই সারিতে পরিবেশন করছে অভয়। তাকে ডাক দেয় জঙ্গল—ওরে অভয়, এই পাতে লুচি দে যা, আর কুমড়োর ছক্কা।

জীবন একবার ফিরে চায় জঙ্গলের মুখের দিকে। মুখ থেকে তার চোখ নেমে আসে জঙ্গলের পায়ের ওপর। বলে, জুতো পরে ঘুরে বেড়াও কেনে? যাও না, খুলে রেখে এসো।

জঙ্গল ভুলে গেছে, তার পায়ে জুতো জোড়া আছে। আর এটাও বোঝে, এখানে জুতো পায়ে দিয়ে ঘোরাটাও ঠিক নয়। 'ভালো কথা মনে করে দেছো' বলে তাড়াতাড়ি চাঁদোয়ার বাইরে চলে যায়। জুতো জোড়া একান্তে খুলে আবার জীবনের কাছে আসে।

জীবন একবার তার স্যাঙাতদের মুখের দিকে ফিরে তাকায়। আর জঙ্গল উবু হয়ে বসে জীবনের সামনে।

—তোমারে যে নেমতন্য দেছে বাসুদেব? জীবন বলে, তুমি তো জলকর নে মোড়লের শিরদাঁড়া ভেঙে দেছো।

—ও সব কথা থাক। জঙ্গল বলে, এখেনে সবাই এইচি একজন মরা

মানুষের ছেরাদ্দে—কবে কার সঙ্গে কি হইছিল, সে কথা নে কচলাকচলি করার জায়গা এটা নয়।

—তোমার সঙ্গে আমারো একবার দেখা হওয়া দরকার। জীবনের কণ্ঠস্বর যদিও অনুচ্চ, তবু ধার আছে। বলে, পুরনো একটা হিসের বকেয়া পড়ে আছে, তাই না?

কথাটা তলিয়ে বুঝতে যেটুকু সময়। জঙ্গলের রক্তে আগুন লেগে যায়। কিন্তু মনের রাশটা টেনে রাখে জোরের সঙ্গে। বলে, কার দেনা কার পাওনা সেটা মিল করে নেও আগে—তারপর বোঝাপড়া করা যাবে। শুধু হিসেব কষার আগে আমার নামটা মনে রেখো।

জঙ্গল আর বসে না সেখানে। জানে কথা কাটাকাটি থেকে একটা না কেচ্ছা কেলেঙ্কারী ঘটে যায়।

একান্তে একটা বেঞ্চির কোণে বসে পড়ে জঙ্গল। মাথার শিরগুলো তখনো দপ দপ করছে। এর মধ্যে আরো কতকগুলো ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। বাসুদেব মোড়ল হয়তো কোনো মতলব এঁটে তাকে 'নেমতন্ন' করেছে।

একবার গলা ঝেড়ে থুতু ফেললো জঙ্গল। তারপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসলো।

ঘুরে ঘুরে ফের গজেন আবার এক সময় জঙ্গলের কাছে আসে। বলে, এবারে তুমি বসে পড়বা জঙ্গল।

জঙ্গলের গা ঘেঁসে বসে গজেন। একটু চুপি স্বরে বলে, বড়ো মোড়লের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। কীত্যনে মাগীরে একেবারে শোবার ঘরে নে তুলেছে। আর মাগীও তেমনি বেহায়া—একেবারে তক্তপোষের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে মোড়লের বৌকে বললে, ওগো মোড়লের বো আমারে একটা নরম পাশ বালিশ দ্যাও না—এই পা দুটো তুলে দেই। মাগীর দেমাক যেন ফেটে পড়তেছে। মাগীর কথা আমি নিজের কানে শুনে এ্যালাম, নিজের চোখে দেখে এ্যালাম মাগী মোড়লের বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে আছে।

গজেনের কথা কানে শুনেও কোন মন্তব্য করে না জঙ্গল। সে তখন ভাবছে অন্য কথা। ভাবছে, জীবনের তড়পানি এবারে ভাঙতে হবে। এমন টাইট দেবে যাতে আর কখনো মাদারগাছে গা ঘষতে না আসে।

—ভাবো কি? গজেন বলে, তোমারে তো ভাবতি দেখিনে।

কথায় ছেদ পড়ে। যারা খেতে বসেছিল উঠে পড়েছে। একদলের খাওয়া

খাওয়া চুকলো। এখনো যত মানুষ জন রয়েছে, আরো দুবার বসাতে হবে। কম নয়, একেবারে প্রায় শ চারেক লোক বসছে। এছাড়া ভিতর দিকের উঠোনে মেয়েরা আছে।

বাসুদেব নিজে এলো জঙ্গলকে ডাকতে। জঙ্গল 'না না' করলেও শেষ পর্যন্ত বসতে হলো তাকে।

জঙ্গলকে একটি সারির মাঝখানে নিয়ে বসালো বাসুদেব। পরিবেশন কারীদের ডেকে বললে, জঙ্গলকে একটু দেখে শুনে খাওয়াবে।

জঙ্গলের খাওয়ার ব্যাপারটা এ তল্লাটে গল্পকথার মতো। এমনিতে যে খুব বেশী খায় তা নয়—তবে যদি ইচ্ছে করে তা হলে বেদম খেতে পারে।

জঙ্গল প্রথমটা তেমন খেতে চায়নি। কিন্তু শেষটা আর 'না' করে পারলো না। বাসুদেবের ভগ্নিপতি সুধন্য এসে উবু হয়ে বসলো জঙ্গলের সামনে। বললে কোনো কথা শোনবো না—তোমার বাপের নাম রাখতে হবে।

জঙ্গল বললে, আমার নাম কি শুধু খাওয়ায়?

সুধন্য বললে, না তা হবে কেন? জঙ্গল পাহাড়ীরে বাদাবনের দেশের মানুষ এক ডাকে চেনে।

লুচির ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল হারান, তাকে দাঁড় করিয়ে সুধন্য বলে, দে গণ্ডা পাঁচ ছয় দে যা।

জঙ্গল বলে, লুচি খেয়ে পেট ভরাবো কেন—মোড়ল বাড়ি এইচি, মেঠাই মণ্ডা খাবো। হারান তুই লুচির ঝুড়ি নে যা। পানতোর মালসা আর দই নে দাঁড়াবি—বুঝিছিস।

খেতে বসে জঙ্গলের মেজাজটাই বদলে গেছে। সবাই দেখছে জঙ্গলের খাওয়া। তারিফ করছে। বাবার নাম রেখেছে বটে জঙ্গল। পুরো এক হাঁড়ি দই হাপুসহুপুস করে সাবাড় করে দিলে, তারপর পনটাক খানেক পানতুয়া। এর ওপর কয়েক থাবা বঁদে তো আছেই।

মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় জঙ্গলের খাবার কথা। মোড়ল বাড়ির দোতালায় শুয়ে ছিল রাধা। তারও কানে গেছে। বিন্দে এক সময় ডাক দিলে রাধাকে, ওরে রাধা জানালা দিয়ে দেখবি আয়, কালকের দেখা সেই নেয়ের মাঝি কি রকম গরুর মতো হাঁসহাঁস করে খাচ্ছে।

আড়মোড়া ভেঙে রাধা উঠে বসলো। তারপর শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে সড়িয়ে জানালার কাছে এলো। এক নজরে দেখেই চিনলো জঙ্গলকে। মানুষটাকে

একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। রাধা চেয়ে থাকে মানুষটার মুখের দিকে। মাথা গুঁজে পানতুয়া খাচ্ছে মানুষটা।

—আমার গা ঘিন ঘিন করছে, বিন্দে বলে, ও কি মানুষের খাওয়া। হ্যাঁরে নিখাকি রাধা, বেশী খাওয়া দেখলে তো তোর পেটের ভাত উঠে আসে। মনোহর বেশী খায় বলে তুই তো তার খাওয়ার সময় তার পাশেই থাকিস নে। এখন যে দেখছিস বড়ো।

—বিন্দে, রাধা স্বর টেনে বলে, তিন রাত কীর্তন গেয়ে আবার তো ফিরে যেতে হবে। দেখে নিচ্ছি তাই—গল্প করতে পারবো তো। লোকে শুনবে।

—আর কিছু না। বিন্দে বলে, মানুষটা জোয়ান বটে। আর মুখের আদলটা দেখেছিস, ঠিক যেন কেষ্ট ঠাকুর। কলির কেষ্ট তো, তাই চেহারা ভীমের মতো।

রাধা একবার বিরক্তি ভরা চোখে তাকালো বিন্দের মুখের দিকে। বিন্দে চুপ করে গেল। কিন্তু তার মধ্যেও চাপা বিদ্রুপের ভাব। অথচ এই মুহূর্তে বলতে পারছে না কিছু। রাধার ইচ্ছের ওপরেই তার যা কিছু। বিন্দের গলা যতই মিষ্টি হোক, তবু তো কোনদিন সে রাধা বোষ্টমীকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না। রাধার গলা বাঁশীকেও হার মানায়। তারপর গানের মধ্যে সে যেমন ভাবে বিভোর হয়, এ ভাব সে কোথায় পাবে।

একদিন সে রাধাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁরে রাধা, এমন ভাব তুই কোথায় পাস রে? তোর সুরে যখন সুর মেলাই, তখন অবাক হয়ে ভাবি, কেমন করে সুরকে তুই ভাবের রসে জারিয়ে নিস!

রাধা বলেছিল, বিরহের আগুন জ্বেলে ভাবকে পাক করে নিতে হয় রে। ভাব তোর আসবে কি করে, তোর আগুনে জল ঢেলে দিয়েছে মনোহর। তুই নিজেই তো ভাবের মুখে পাথর চাপা দিয়েছিস।

বিন্দের মনে পড়লো সেদিনের কথা। মনের মধ্যে কেমন জ্বালা ধরে গেল। বললে, দেখিস নোনা গাঙের দেশে এসে যেন বিরহের আগুন নিবে না যায়। কালো রূপের ছায়াটা যেন তোর মনটাকে ঢেকে না দেয়।

রাধা মৃদু শব্দ করে হাসে। জানালা ছেড়ে উঠে আসে বিছানায়। নরম গদির ওপর দেহটা ছড়িয়ে দেয়। পাশ বালিশটা ঠেলে পায়ের নিচে দিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে আরম্ভ করে। রূপোর মলে শব্দের মৃদু তরঙ্গ ওঠে। আর তার কণ্ঠে জাগে মৃদু সুরের ঝংকার।

বিন্দে একবার আড় চোখে রাধার দিকে তাকিয়ে, 'সোহাগী' বলে কোমরের মাংস পিণ্ড নাচিয়ে চলে যায় পাশের ঘরে।

রাধা পাশ ফিরে শোয়। চোখের সামনে জানালা। জানালা দিয়ে দেখতে পায় দূরের কতকগুলো ক্যাওড়া গাছ। ক্যাওড়া গাছের ওপারে এক খণ্ড আকাশ। যেখানে কালো মেঘ জমে উঠেছে।

কালো মেঘের দেশে রাধার মনটা উধাও হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

শ্রাবণের মেঘ কিন্তু জমলো না। এক পশলা বৃষ্টি দিয়ে ঝড়ের সঙ্গে হারিয়ে গেল। বর্ষা ধোয়া আকাশে চাঁদ উঠলো। চাঁদের আলোয় চারদিক ভরে গেল।

রাধা বোষ্টুমীর গান হবে যোগেশগঞ্জের মোড়ল বাড়িতে। কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দূর গ্রাম পর্যন্ত। সন্ধ্যে না হতেই ছোট বড়ো দলে মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো ভিড় জমালো উঠোনের সামিয়ানার নীচে। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল উঠোনের মাটি। বালির গাদা ছিল পাশে, সেখান থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি বালি এনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

সতরঞ্চি, ত্রিপল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকি জায়গায় বিছানো রয়েছে নাড়া-পল। বাসুদেবের ঢালাও ব্যবস্থা। রাতে যারা গান শুনতে আসবে, তাদের জন্যে শুকনো-ফলারের আয়োজন। মাথা পিছু এক সরা চিঁড়ে-মুড়কি আর টিউবওয়েলের জল তো আছেই।

জঙ্গলের তো চেলা-চামুণ্ডা কম নয়। সে না থাকলে, ওই গাদার বালি টেনে এনে ছড়িয়ে দেবার লোক জুটতো না। জঙ্গলের কথা অমান্য করার জো কি। তবে শুধু ভয়ে নয় ভালোবেসেই করে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে জঙ্গল তো ঠাকুর দেবতার মতো।

সুধন্য তো একসময় জঙ্গলের দুটো হাত ধরে বলে গেল, জঙ্গল তুমি আজ যা করলে তা কোনোদিন ভোলবো না।

জঙ্গলও সঙ্গে সঙ্গে তার কথা শুনিয়ে দিতে ভোলেনি।—আমার কথা

মনে না রাখাই ভালো। কিসের জন্যে মনে রাখবা? তোমাদের ভিজে উঠোনে বালি ছড়ায়ে দিছি, তাই?

সুধন্য তবুও বলে, এতো তো মানুষ ছিল—এ বুদ্ধিটা তো কারো মাথায় আসেনি। তাছাড়া এতো বড়ো উঠোনটায় বালি ছড়ানো কি চারডিখানি কথা।

জঙ্গল বলে, আমারে নে ব্যস্ত হয়ো না। লোকজন আসতিছে, তাদের আদর-আপ্যায়ন করো গে।

সুধন্য প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা জঙ্গলকে দিলে, একটা নিজে ধরালো।

জঙ্গল এবারে হাত-পা ঝেড়ে ঝুড়ে আসরের সামনে গিয়ে বসলো। কোথায় ছিল অন্ত বাউলি, ঠিক তার কাছটিতে এসে জায়গা করে নিলে।

জঙ্গল শুধোয়, ছিলে কোথায় এতো সময়?

অন্ত বলে, গজেনের বাড়ি গে লম্বা একটা ঘুম দে এ্যালাম।

জঙ্গল বলে; তারপর কেমন লাগতেছে বলো।

অন্ত বলে, এলাহী কাণ্ড কারখানা করেছে বটে বাসুদেব। কিছু না হোক, বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার ব্যাপার।

জঙ্গল হঠাৎ চুপ করে যায়। তার মনে হয়, বাসুদেবের বাপ ছিল একটা জ্যান্ত শয়তান। লোকের সর্বনাশ করে কয়েক শ' বিঘের জমির মালিক হলো। জমিদারের তৌনাত হলো মোড়ল। বাপের বেটা বাসুদেব—সেও কম যায় না। জমিজমার আয় তো আছেই, তারপর সুদের কারবার করে ফুলে কেঁপে উঠলো। আর একটা জলকরও করেছিল—যে জলকর থেকে তাকে উচ্ছেদ করলো জঙ্গল পাহাড়ীর দল।

এই মুহূর্তে জলকরের কথা মনে পড়তে জঙ্গলের মেজাজটা ভেতর ভেতর বিগড়ে গেল। এই মেজাজ নিয়ে গানের আসরে বসে থাকা যায়? তবু উঠতে পারলো না সে। রাধা বোস্টুমীকে দেখার জন্যে তার মনটা কেমন আনচান করছে।

রাধা বোস্টুমীর দল আসরে আসছে। হারমোনিয়াম ঘাড়ে করে এলো কোল কুঁজো বুড়োটা। তার পর আলু-আলু চেহারার ছোকরাটা এলো ঢোলক নিয়ে। মনোহরের হাতে খোল। বিন্দে তার মোটাসোটা দেহটা দোলাতে দোলাতে আসরে বসেই একখিলি পান মুখে দিয়ে চিবোতে আরম্ভ করলো। এবারে রাধা আসছে। রাধার পায়ে বাঁধা ঘুঙুর—হাতে খঞ্জনী।

রাধা আসছে। ললিত লবঙ্গলতার মতো। পরণে তার গেরুয়া রঙের সিল্কের শাড়ী, রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ, গলায় তুলসীর মালা আর নাভিদেশ পর্যন্ত লুটিয়ে আছে টগর কুঁড়ির গোড়ের মালা। ললাটদেশে শ্বেত-চন্দনের রসকলি। কাজল টানা দুটি চোখে ভাবের ঘোর।

রাধা আসরে এসে মাথা নীচু করে নমস্কার রাখলো চারদিকে ভিড় করা হাজার হাজার শ্রোতার উদ্দেশ্যে। তারপর সুর টেনে টেনে বললে, আমি আপনাদের কাছে এসেছি রাধা-কৃষ্ণের বিরহ মিলনের কথা শোনাতে। কতটুকু আমার ক্ষমতা। তবে আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে, আমি রাধা-কৃষ্ণের কথা শোনাতে পারি। আমি যে আশীর্বাদ আর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুরই কাঙাল নই।

কী মিষ্টি আর সুরেলা কণ্ঠস্বর। রাধার কণ্ঠে আর চোখের চাউনীতে যেন যাদু আছে। হাজার হাজার মানুষ চুপ করে গেল রাধা আসরে নেমে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।

জঙ্গল অবাক চোখে দেখলো রাধাকে। আর রাধার দু চোখ পলকের জন্যে তার চোখে এসে মিললো। পরক্ষণে আবার নিজের মধ্যে ফিরে গেল রাধা। এবারে তার গান শুরু হবে।

আসরে হাটু মুড়ে বসলো রাধা। একটি হাত শূন্যে তুলে খঞ্জনী বাজাতে আরম্ভ করলো। একটি পা সামনে এনে অদ্ভুতভাবে নাচাতে আরম্ভ করলো। সেই সঙ্গে বেজে উঠলো ঘুঙুর। তারপর শরীরে তরঙ্গ তুলে রাধা উঠে দাঁড়ালো।

বাজছে খঞ্জনী। বাজছে ঘুঙুর। খঞ্জনী আর ঘুঙুরের ছন্দে, নাচের ভঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের বন্দনা করলে রাধা। তারপর এক সময় একটি পা বাড়িয়ে দিলে কোল কুঁজো বুড়োর দিকে। বুড়ো তার পায়ের একটা ঘুঙুর আরো আঁট করে বেঁধে দিলে।

এবারে আসরে মাঝখানে বসলো রাধা। খঞ্জনী দিলে বিন্দের দিকে। তারপর মধুর কণ্ঠে সুর ধরলো। সুরের মধ্যে কীর্তনের ভাষা—যাদুকরী কণ্ঠে রাধার কীর্তন আরম্ভ হলো।

কীর্তনের মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন হলো আসর।

মাঝরাতে কীর্তনের আসর ভাঙলো। আবার ভিড় করা মানুষগুলো কলরব করে উঠলো। কীর্তনীয়ার দল চলে গেল ভিতর বাড়িতে। সেই সঙ্গে ছুটলো একদল মানুষ।

জঙ্গল বসেছিল চুপচাপ। অন্তের ডাকে তার চমক ভাঙলো। কি রে, মজলি নাকি ?

জঙ্গল কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

অন্ত আবার বলে, ওরে আমি তোরে দেখেই বুঝিচি কীত্যনে মাগী তোর মনে রঙ ধরিয়েছে।

— বাউলি। জঙ্গল ধমকে উঠলো। মরতে বসেও তোমার স্বভাব বদলালো না ?

অন্ত'র শরীরে রাগ নেই। জঙ্গলের ধমক খাওয়ার পরেও সে ফিক্‌ফিক্ করে হাসে। বলে, বাউলির চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি নে। তুই দেখছিলি কীত্যন ছুঁড়িরে, আমি তোরে দেখছিলাম। জয় মা কামিখ্যে। তন্তর-মন্তর বশীকরণ-- সবই তো তোমারি ইচ্ছেয়।

জঙ্গল দাঁড়ায় না। ভিড় ঠেলে বাইরে যায়। তারপর ভেড়ি পথ ধরে চলতে আরম্ভ করে।

ডুবে যাবো-যাবো করেও, তখনো চাঁদ আকাশের কোণে জ্বলছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে পিছল ভেড়ি পথ ধরে জঙ্গল চলতে আরম্ভ করে। সামনে পিছনে আরো কিছু মেয়ে-পুরুষ যাচ্ছে, কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলার মতো মন নেই জঙ্গলের। এখন মনটাকে শান্ত না করলে নয়। একবার হিমে সা'কে না ডেকে তুললে নয়।

পারঘুমটি পৌছতে চাঁদ ডুবে গেল। তিথির হিসেব করে জঙ্গল বুঝলো, রাত তিনটে বেজেছে।

একবার মনে হলো, এই রাতে আর হিমে সা'কে ডাকবে না। কিন্তু পথ তাকে হিমেসা'র উঠোনেই পৌছে দিলে।

একটা খ্যাঁকখেকে কুকুর দাওয়া থেকে লাফিয়ে তেড়ে এলো। ক্যাঁত করে কুকুরটাকে সজোরে একটা লাথি মারলো। ককিয়ে উঠলো কুকুরটা।

ভেতর থেকে ব্যস্ত কণ্ঠ শুনতে পেল জঙ্গল।—কেডা, কেডা বাইরে।

হিমে সার ঘুম ভেঙে গেছে কুকুরের ডাক আর ককানিতে।

—আমি জঙ্গল। একবার বাইরে এসো।

—এতো রাত্তিরে। কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার আবার কি। মাল চাই।

দরজা খুলে হিমে সা বাইরে এলো।

জঙ্গল দাওয়ার নীচে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে বললে, আরে শুধু হাতে বেরোলে কেন? এক বোতল কড়া মাল নে এসো। নগদ টাকা দিচ্ছি।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো, এই রাত দুপুরে মালের নেশা চাগিয়ে উঠলো।

—দুত্তোর, আমার এখন কথা বলার সময় নেই। ত্যাও দিকিনি কি দেবা, পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে হিমে সা'র হাতে গুঁজে দেয়। বলে, যাও তাড়াতাড়ি নে এসো।

অন্ধকারের মধ্যে একটি বোতল বার করে আনে হিমে সা। ছিপিটা খুলতে যেটুকু সময়। বোতলের মুখটা দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে দিয়ে হড় হড় করে পুরো বোতলটা ঢেলে ফেললো জঙ্গল। তারপর বোতলটা দাওয়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলে অন্ধকারে মধ্যে পা বাড়ালো সে।

বাড়িতে এসে মা'কে ডাকলো না জঙ্গল। দ্বিজু থাকে ছোট কামরাটায়, তাকেও জাগালো না, চালের বাতায় গোঁজা চাটাইটা বাইরের দাওয়ায় পেতে নিয়ে দুটি হাত মাথার নীচে ভাঁজ করে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সে।

চোখের সামনে তখনো রাধার মুখটা ভাসছে। আর শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা হচ্ছে, মদের নেশাতেও যা চাপা পড়ছে না। রাধার মুখটা মনের মধ্যে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লো জঙ্গল।

ভোর হয়েছে। সুমণি ঘুম থেকে দরজা খুলে বাইরে এসেই দাওয়ার ওপর ঘুমন্ত ছেলেকে দেখে চমকে উঠেছে। কিন্তু ডাকেনি ছেলেকে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে ডাকার ইচ্ছে থাকলেও ডাকতে পারেনি। দ্বিজুও উঠেছে। সকালে ডিঙি নিয়ে যাওয়ার কথা দয়াপুরের হাটে। সনাতন দাসের ধান যাবে। কিন্তু জঙ্গল না উঠলে একা কি করে যাবে ডিঙি নিয়ে। অথচ বায়নার টাকা গুঁজে দিয়ে সনাতন বলে গেছে, সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে ডিঙিতে মাল তুলে দেবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে সে আগে সনাতনের বাড়িতে গেল। বলে এলো, ডিঙি গেরাবি করা আছে ঘাটে, ধানের বস্তা ততক্ষণে তুলে দিক। এর মধ্যে জঙ্গলকে সে ডেকে আনবে।

কিন্তু ঘাট থেকে ফিরে এসেও দ্বিজু দেখলো জঙ্গল ঘুমোচ্ছে। ডাকবে কি ডাকবে না মনে করছে, এমন সময় জঙ্গল তড়াক করে উঠে বসলো। তার

চোখ দুটো তখন জবা ফুলের মতো লাল। নেশার ঘোরটা তখনো রয়েছে। উঠে, সামনে দ্বিজুকে দেখেই বললে, এক ঘটি জল নে আয় তো।

বাসি মুখে এক ঘটি জল খেয়ে জঙ্গল আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো। বললে, কিরে ভাড়াটাড়া আছে নাকি?

ভাড়ার কথা বললে দ্বিজু। কাল সন্ধ্যেবেলা পাঁচটা টাকা বায়না দিয়ে গেছে সনাতন, সে কথাটাও বললে।

—তুই যা। জঙ্গল বললে, পারবি নে একা যাতি?

—একা কি ভরসা করা যায়? দ্বিজু বললে, বলো তো মাদার মোল্লার ছেলেরে নে যাই। এক বেলার খোরাকি, আর দু-তিনটে টাকা দিলেই হবে।

—তবে তাই নে যা। জঙ্গল বললে, আমার শরীরে তেমন জুৎ নেই।

শরীরে জুৎ নেই—জঙ্গলের মুখে এ যেন নতুন কথা। ওর শরীর তো লোহার শরীর। রোদ-জল-ঝড়, বারো মাস ছয় ঋতু—ওর দেহটা একদিনের জন্যে বেজুৎ হয় না আর সেই কিনা বলছে শরীরে জুৎ নেই

—জানিস, কাল পনটাক খানেক পানতো, এক হাঁড়ি দই আর সেরটাক খানেক বঁদে খেইছিলাম! আর কুমড়োর ছক্কা, ছোলার ডাল দে লুচিও মেরে দিইছিলাম অনেক—তারপর রাত জেগে কেত্তান শোনা—আজ দুপুরে টেনে ঘুম দিলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবানে—বলে জঙ্গল দাওয়ার ওপর থেকে নেমে আসে উঠোনে।

ছাঁচতলায় জলের কোলা থেকে খোপে ঢেলে জল নিয়ে মুখ ধোয় জঙ্গল। মাকে ডেকে বলে, আমি আসতিছি মা- তুমি ততক্ষণে দ্বিজুরে পান্তা গুড় দ্যাও—আমি এখন কিছু খাবো না।

পায়খানায় যাবে বলে বেরিয়েছিল জঙ্গল। যাবার মুখেই দেখা হলো স্যাঙাত বদনের সঙ্গে!

জঙ্গলের একান্ত অনুগতদের মধ্যে বদন বাছাড় একজন। বদনই জীবনের কথাটা বলে সকালে জঙ্গলের মাথাটা গরম করে দিলে।

বদনও কাল বাসুদেব মোড়লের বাড়ি কীর্তন শুনতে গিয়েছিল। সেখানেই জীবনের সঙ্গে দেখা। জীবন তখন নেশার ঘোরে ছিল। বদনকে ডেকে বলে দেয়, তোদের ধরমবাপ জঙ্গলরে বলে দিস—জীবন ঢালি পুরনো কথা ভুলে যায় নি। সে পুরনো ঘায়ে মলম লাগাতি এইছিল—ওর মলমে সে ঘা শুকোবার নয়।

—তুই কি বললি?

—আমি আর কি বলবো, বললাম জঙ্গল পাহাড়ীরে জানিয়ে দেবানে তোমার কথা, তারপর যা করার সে-ই করবে। আমরা তো তারেই চিনি।

—বেশ বলছিস। জঙ্গল বলে, জানিস—কাল মোড়ল বাড়িতে আমারই ভুল হইছিল জানোয়ারটার সঙ্গে কথা বলতি যাওয়া। আমি ভাবলাম, এটা ছেরাদ্দ বাড়ি -আমরা সবাই এইছি একজন মরা মানুষের নামে—এখেনে শত্তুর-মিত্তির নেই। বুঝলি বদন—জঙ্গল পাহাড়ীরে জীবন ঢালি এখনো চেনেনি।

বদন এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর বলে, তুমি শুনে রাখো জংলিদা—ওই শয়তানের মদত দেচ্ছে বাসুদেব। বাবার কালে কখনো শুনেছো—মায়ের কাজের দিন ছেলে মাল টেনে ধুমসি মাগীরে নে মজা করতেছে।

বদনই বলে যায় আদ্যোপান্ত ঘটনা। খানিক সে চোখে দেখেছে, খানিক কানে শুনেছে।

কীর্তন শেষ হতে জীবন ঢালি, বাসুদেব, গজেন এরা পলগাদার পাশে গিয়ে মদ গেলে। আর কীর্তনের দলের মনোহর বলে ছোঁড়াটা তো মদ গিলে পল গাদার পাশে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। ধুমসি মাগী—যেটা 'দোহারগিরি' করছিল তাকেও নাকি খানিকটা মদ জোগায়। তারপর পল গাদার পাশেই আরম্ভ হয়ে যায় কেচ্ছা কেলেঙ্কারী। রাধা বোষ্টুমীর ওপরেই আছে নজরটা তবে সে তো চালাক মেয়ে। আসর ছেড়ে সে সোজা চলে যায় বাসুদেবের বৌ-এর কাছে।

জঙ্গলের চোখ দুটো জ্বলে উঠে। নাকের ডগাটা মোটা হয়ে ওঠে, থর থর করে কাঁপে। জঙ্গলের শরীরে উত্তেজনা এলেই এ লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। একটু ভেবে জঙ্গল বলে, তোরা চারদিক একটু খেয়াল রাখিস, আর শোন, ওসমান চাচারে একবার খবর দিস যেন আমার সঙ্গে আজই দেখা করে।

দুপুরে ঘুমিয়েছিল জঙ্গল, উঠলো সন্ধ্যের মুখোমুখি। বাসুদেব মোড়লের বাড়ি যাবার ইচ্ছেটা আজ মনের মধ্যে ছিল না এমন নয়, কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করেছে আজ আর সে কোথাও যাবে না। দ্বিজু ফিরলে তাকেই বলবে হিমে সার বাড়ি থেকে একটা বোতল নিয়ে আসতে। সকালের জোয়ারে গেছে দ্বিজু সন্ধের ভাঁটায় নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

দাওয়ায় বসে বিড়ি টানছিল জঙ্গল, ওসমান এলো। ঢ্যাঙা চেহারার

মানুষ ওসমান, গায়ে তেমন মাংস না থাকলেও সত্তর বছর বয়সেও এখনো তার দেহটা সিধে। আর মনেও তার দুরন্ত সাহস।

জঙ্গলের বাবা দুর্জয় পাহাড়ী, ওসমান তারই হাতে গড়া মানুষ। দুজনের বন্ধুত্বে কখনো চিড ধরেনি। জঙ্গলের মনে থাকার কথাও নয়, তবু মা'র কাছে শুনেছে ওসমান চাচার কথা। মা-ই বলতো, তোর বাবা চলে গেলে কি হবে, ওসমানই আমাদের বাঁচিয়েছে। ও না থাকলি তোরে নে আমি ভেসে যেতাম। ওসমানের দেহটাও যেমন লম্বা, মনটা তেমনি বড়ো। ওর বৌ-টাও তেমনি। দুজনে মিলেই তো আমারে দেখেছে।

দিনের সঙ্গে অনেক কিছু বদলে যায়। কিন্তু ওসমান চাচার 'চরিত্তির' বদলায়নি। এখনো জঙ্গল মানুষটার কথা 'মান্যি' করে। ডাকেও চাচা বলে। আর ওসমানও তাকে নিজের মতো মনে করে।

ওসমান আসতেই চৌকিটা এগিয়ে দেয় জঙ্গল। সুমনিও বাইরে আসে। ওসমান চিরদিন 'ভাবী' বলে ডেকে এসেছে সুমনিকে। আর সুমনিও চিরকাল এক নজরে দেখে আসছে।

প্রথমে এটা-ওটা কথাবার্তা হলো সুমনির সঙ্গে। তারপর সুমনি এক বাটী চিড়ে আর গুড় এনে রাখলো ওসমানের সামনে। বললে, আজই দুপুরে বালিখোলায় ভাজিচি চিঁড়ে....খাও। ওসমান 'হাঁ' করে বললে, দেচ্ছো যখন, পাকড়ে পাকড়ে খাচ্ছি, নয়তো দাঁত যে কটা দেখতিছ ভাবী, তা-ও নড়বড় হয়ে গেছে। যে কটা আছে, তুলে ফেলতি পারলে বাঁচি।

শুকনো চিড়ে গুড় দিয়ে মেখে একটু মোলাম করে নেয়। তারপর দু'চার গ্রাস খেয়ে বলে, খেজুরের গুড় দে চিঁড়ে—ওর একটা আলাদা 'তার'। এসব খাওয়া উঠে যাবে দিনকতক বাদে। আমার বাড়িতেও অব্দি চা ঢুকেছে। আমিও দুবেলা খাচ্ছি। যাই বলো চা-য়ে খানিকটা 'তাগোদ' এনে ছায়।

একথা ও-কথা থেকে পুরনো দিনের কথা এসে পড়ে। দুর্জয় পাহাড়ী, আর ওসমান গাজী...দুজনের জীবন যেন এক মুঠোয় বাঁধা। দু'জনেরই সমান সাহস। ওদের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। কিন্তু দু'জনের চরিত্রে একটা জায়গায় অমিল ছিল। দুর্জয় ছিল বেহিসেবী—মাথায় রোখ চাপলে আর কোনোকিছু ভাবতো না—কিন্তু ওসমান কখনো হিসেবের বাইরে যেতো না। আর বেহিসেবী দুর্জয়. শেষটা জীবন দিয়ে খেসারত দিলে। দুর্জয়কে বাচাতে পারলো না....এর জন্যে একটা চাপা দুঃখ

রয়ে গেছে ওসমানের। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েলা ফোঁটায় ফোঁটায়। সুমণির মনটা কান্নায় ভিজে উঠলো। আস্তে আস্তে সে চলে গেল ঘরের মধ্যে। জঙ্গলও এতো সময় চুপচাপ বসে শুনছে ওসমান চাচার কথা। আর একটা কথাই তার মনের মধ্যে এসেছে....ঈশ্বর পাহাড়ী, তস্যপুত্র দুর্জয় পাহাড়ী তস্যপুত্র জঙ্গল পাহাড়ী .. রক্তের একটা দুরন্ত ধারা বয়ে চলেছে।

– তারপর বল তোর কি খবর ?

যেটুকু বলার সবই বললে জঙ্গল। শান্তভাবে সবই শুনলো ওসমান। তারপর একটা কথাই বললে, বোষ্টমীর দল কবে কখন ডিঙিতে উঠবে, সে খবরটা জানার দরকার। আমার মনে হয়, তারা যদি ক্যানিং দে যায়, তা হল্লি মোল্লাখালি পর্যন্ত ডিঙিতে গে তারপর লঞ্চ ধরবে। ঠিক খবরটা পেলে আমাকে খবর দিবি। তারপর যা হয় ঠিক করা যাবে।

শুধু এই কটি কথা বলেই ওসমান চুপ করলো। ওসমান বেশী কথার মানুষ নয়, তা বলে তা অনেক হিসেব করেই বলে।

ওসমান উঠে পড়লো। জঙ্গল ভেড়ি পথে খানিক দূর এগিয়ে দিতে এলো। যাবার সময়ে ওসমান বলে গেল, জঙ্গল যেন নজর চারদিকে রেখে চলাফেরা করে।

বাড়ি না এসে জঙ্গল সোজা চলে গেল হিমেসা'র আড্ডায়। সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে কটা মানুষ বসে আছে। তার মধ্যে 'পাত কুড়ুনে' খাওয়া নারদ মুনি কানাইরেও দেখতে পেল।

আড্ডায় না বসে জঙ্গল হিমেসাকে ডেকে ভিতর বাড়িতে গেল। সেখান থেকেই একটা বোতল বগলদাবায় করে খিড়কি দিয়ে বাড়ির পথ ধরলো।

॥ ছয় ॥

শেষ রাতে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। মুষল ধারায়। সঙ্গে এলোপাতাড়ি বাতাস। সেই বৃষ্টি আর ঝড়ের মধ্যেই সকাল হলো।

দুরন্ত গাঙ রায়মঙ্গল ক্ষেপে উঠেছে। উন্মাদ ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাড়ের মাটিতে। ধারে কাছে একটা ডিঙিও নেই। যে যার ডিঙি-নৌকো খাড়ি কিংবা খালের মধ্যে বেঁধে রেখেছে।

এই দুর্যোগের মধ্যেই রাধা বোস্টুমীর দল যোগেশগঞ্জ ছেড়ে যেতে চায়। বাসুদেব তাকে অনেক করে বোঝাতে চেয়েছে, আজ যাওয়া চলবে না। ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। এমন কেউ নেই এই ঝড়-তুফানে তাদের মোল্লাখালির লঞ্চঘাটায় পৌঁছে দেবে।

কথাটা রাধাই বলছে, কেন—তোমাদের দেশের সেই মাঝি—যে আমাদের সেই রাতে পার করে নিয়ে এলো।

—জঙ্গল ? বাসুদেব বলেছে, জঙ্গলের কি ঠিক-ঠিকানা আছে। ডাকলেই তারে পাওয়া যায় না।

—আমার নাম করে ডাকলেই সে আসবে। কথাটা বলেই রাধা বুঝলো এভাবে কথাটা না বললেই ভালো হতো।

—আচ্ছা দেখছি, কি করতে পারি, বলে বাসুদেব চলে গেছে।

কাছেই বসে ছিল বিন্দে আর মনোহর। রাধার কথা শুনেই তার মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

রাধার দু'চোখ সব সময়ে খোলাই থাকে। বিন্দে আর মনোহরের মনের ভাব বুঝতে তার দেরি হয় না। আরো লক্ষ্য করে বাসুদেবের দু'চোখ বিন্দের চোখের ভাষা পড়ছে।

মোড়লবাড়িতে 'গাওনা' করতে এসে রাধার নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিন্দের বেহাল্লাপনাব কথা তার কানে গেছে। আরো বুঝেছে বাসুদেব মানুষটা কোনো দিক থেকে সুবিধের নয়।

রাধা নিজেকেও গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা মনে করে না—কিন্তু সে চায় না, তার দেহটা লোভী শকুনেরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক।

চার দিন চার রাত—যেটুকু সময় কীর্তনের আসরে কাটিয়েছে, নয়তো বাকি সময় সে থেকেছে মোড়ল বাড়ির দোতলায়। বাসুদেবের বৌ-এর কাছে। বাসুদেবের বৌটি ভালো—রাধাকে চোখে চোখে রেখেছে। তার স্বামীকে তো সে জানে। জানে তার স্বামীর আশপাশে যে মানুষগুলো ঘোরে তাদের চরিত্র। গজেনটাকে সে তো দুচোখে দেখতে পারে না। সুধন্যটা মিটমিটে পাজী। তার স্বামীর মাথাটা তারা বিগড়ে দিয়েছে। নয়তো—'কীত্যনে মাগী'কে আনতে তার আপত্তি ছিল। বলেছিল, মেয়েমানুষ ঢঙ করে কেত্যন করবে ছেরাদ্দ বাড়িতে, এটা কি ভালো? দেশে কি পুরুষ কীত্যনে নেই?

বাসুদেব বলেছিল, তোমার কথার মানে আমি বুঝি। তুমি কি ভেবেছো তোমার ওই জরি পাড় শাড়ীর আচলে আমি বাঁধা হয়ে থাকবো। আমি যা খুশি তাই করবো—রাধা বোষ্টুমীর দল বায়না করিচি, তারা গান করতে আসবে। মোড়ল বাড়ির ব্যাপারে তুমি নাক গলিও না।

বাসুদেবের বৌ চুপ করে গিয়েছিল। তারপর এই নিয়ে আর কোনো কথা বলে নি।

সেদিন পল গাদার পাশে ধুমসি বৌ বিন্দেকে নিয়ে যে কাণ্ড-কারখানা ঘটেছে বাসুদেবের বৌয়ের কানে গেছে সে সব কথা। কিন্তু কানে শুনেও স্বামীকে কিছু বলে নি। স্বামীর চোখ পড়েছে রাধার ওপর। তা সে লক্ষ করেছে। কিন্তু স্বামীর কাছে সে বোকা ভালো মানুষ সেজেই আছে। স্বামীকে নয়, রাধাকে সে চোখে চোখে রেখেছে। রাধা যেন তার কতো আপন জন—এমনি ব্যবহার করেছে। নিজের বিছানায় শুতে দিয়েছে রাধাকে—গল্প করেছে, রঙ্গ-রসিকতা করেছে—কিন্তু বাসুদেবকে কাছে ঘেঁসতে দিলেও গোপনে কথা বলতে সুযোগ দেয়নি।

আর রাধাও জানে, মোড়ল বাড়ির বড়ো বৌ, কেন তার কাছে কাছে ঘুরছে ফিরছে কদিন। কিন্তু জেনেও কিছু বলেনি। বারো ঘাটের জল খেয়ে যার কিছু না হোক, মানুষ চিনতে পারে রাধা। বাসুদেব, শুকদেব, গজেন, সুধন্য—সবার চোখেই সে কামের আগুন জ্বলতে দেখেছে। কিন্তু সে আগুনে পোড়ার ভয় করেনি সে। তা ছাড়া বড় বৌ তো তার রক্ষা-কবচ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কদিন।

কিন্তু সব চেয়ে ভয় তার জোড়া ভ্রুর মানুষটাকে। নামটাও জেনেছে সে। জীবন।

জীবন না তো মরণ। কথাটা মনে মনে বলতে চেয়েও উচ্চারণ করে

ফেললো। আর সে কথাটা কানে যেতেই বিন্দে হেসে গড়িয়ে পড়লো। মনোহরের গায়ে ঢলে পড়ে সুর টেনে বললে, শুনছো গা, রাধারাণী কি বলছে? জীবন না তো মরণ।

রাধার চোখ দুটো এমনিতে শান্ত। সে শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলো। একবার বিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে, উঠে বাইরে চলে গেল।

মোড়ল বাড়ীর উঠোনের কোণে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের নীচে বাঁধানো চত্বর। চত্বরের ওপর গোলপাতার ছাউনি। ন্যাড়া মাথা বাসুদেব তার স্যাঙাতদের নিয়ে হিসেবনিকেশ করছে। হাতে খেরোর খাতা। কোন খাতে কত ব্যয় হয়েছে, এখনো কতো দেনা পাওনা আছে, সেই সব কথাই হচ্ছে সুধন্যর সঙ্গে। গজেন ছাড়া আরো ক জন তাকে ঘিরে।

রাধা এলো তার হিসেবের পাওনা বুঝে নিতে। তাছাড়া যে কথাটা একবার বলেছে, সেই কথাটাই নতুন করে পাড়লো।

বাসুদেব তাকালো গজেনের মুখের দিকে। গজেন মাথা চুলকে বললে, কটা দিনতো কেটেই গেল, অন্তত আজকের দিনটা এখেনে থাকো তোমরা। তারপর কাল দুপুরে মোল্লাখালির লঞ্চ ধরে ক্যানিং চলে যাবা।

রাধা বলে, আজই আমরা যাবো, বসে থাকলে কি আমাদের চলে। এখন হিসেবটা মিটিয়ে দাও—তারপর তোমরা না পারো, যাবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেবো।

একজন আধাবয়সী লোক, মাথা জোড়া টাক, আর চোখ দুটো বেড়ালের মতন কটা, হেসে বলে, এটা হলো বাদা-বনের দেশ, নোনা গাঙ তো সাঁতরে পার হতি পারবা না মা লক্ষ্মী—তাই বলি আজ থেকে যাও। এই ঝড় বাদলে নোনা গাঙ পাড়ি দেবে কেডা!

সুধন্য কিছু বলতে যায় রাধার মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু রাধার চোখের দিকে তাকাতে সব গোলমাল হয়ে যায়।

বাসুদেব বলে, তা কি দিতে হবে তোমারে?

রাধা বলে, হিসেবটা মনে থাকারই কথা। বায়নার টাকা একশ বাদ দিলে আর থাকে পাঁচশ টাকা। তা ছাড়া রাহা খরচ শ' খানেক টাকা তো বটেই।

বাসুদেব বলে, তার মানে সাকুল্যে ছ'শ টাকা দিতে হবে।

রাধা বলে, আমার হিসেব তো তাই।

বাসুদেব ফিরে চায় রাধার মুখের দিকে। বিচিত্র ভঙ্গীতে হেসে বলে, চার

বস্তা ধানের দামও তুমি নিতে পারবে না। তুমি চাইছো ছ শ টাকা—আমি তোমায় নীল শাড়ীর আঁচলে হাজার টাকা বেঁধে দেবো—

টেকো লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে। বলে, আজ সন্ধ্যেয় ঘরোয়া আসর বসুক—মোড়লকে একটু রঙ্গরসের গান শোনাও—চারশ টাকা ফাউ পাবা, আর একটু ফাউ শোনবো না?

রাধার কচি কোমল মুখ শক্ত হয়ে যায়। বলে, ও সব ধানের গরম আমাকে দেখিও না। ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দাও—আর যাবার ব্যবস্থা করো—আমি আজই চলে যাবো।

—আচ্ছা, দেখছি কি করা যায়। বাসুদেব বলে, তুমি ততক্ষণ ওপরে গিয়ে বোসো—

সিঁড়িতে রাধার সঙ্গে মুখোমুখি হলো বাসুদেবের ঘরণীর। কদিন এ বাড়িতে এই বৌটিকেই মনের কাছে নিতে পেরেছে রাধা। আর বৌটির মনের ব্যথার স্পর্শ পেয়েই বুঝেছে বাসুদেব মানুষটি কেমন।

বাসুদেবের বৌ-এর নাম ফুলের নামে। শিউলি। স্বভাবটাও শিউলি ফুলের মতো মিষ্টি। শিউলির ব্যথাটা কোথায় সেটুকু বুঝেছে রাধা। নানা জায়গায় ঘোরা 'কীত্যনে' রাধা বালিকা বয়স থেকে কীর্তনের দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর পাঁচ বছর হলো নিজেই দল গড়েছে সে। এর মধ্যে কম মানুষ তো দেখেনি। মানুষ দেখে দেখে মানুষ চিনতে শিখেছে। কিন্তু মনের মতন একটি মানুষও খুঁজে পায়নি আজও।

তবু রাধার মনে পড়লো সেই দুঃসাহসী মাঝি জঙ্গল পাহাড়ীকে। মানুষটার মধ্যে একটা সত্যি মানুষের ছায়া দেখেছে। তবে এখনো যাচাই করে দেখেনি। রাধাকে ভাবতে দেখে শিউলি জিজ্ঞেস করে, ভাবো কি? আজ নাইবা গেলে।

—আমাদের কি থাকতে গেলে চলে। শিউলির খাটে তার দেহটা এলিয়ে দেয় রাধা। বলে, আমরা হলাম স্রোতের শ্যাওলা, ভেসে বেড়াতেই ভালো লাগে। চার দেওয়ালের ঘরে আমাদের দম আটকে আসে। তাছাড়া এ বাড়ীতে ধানের গরম। এখানে আমি দু দণ্ড তিষ্ঠোতে পারবো না। তুমি ভাই কিছু মনে কোরো না—বারো ঘাটের জল খেয়ে আমরা আর এক রকম হয়ে গেছি।

শিউলিকে একটু উন্মনা মনে হয়। হয়তো কিছু বলতে চায়-ও সে। কিন্তু সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেয়ে দরজার দিকে ফিরে তাকায়।

ঘরে ঢুকলো বাসুদেব। ছ'খানা একশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিলে রাধার গায়ের ওপর। তারপর আরো একশ টাকা বার করে বললে, এটা তোমাদের বখশিস।

রাধা তড়াক করে উঠে বসলো। আগুন জ্বললো তার শান্ত চোখে। বললে, রাধা বোষ্টুমী বখশিস নেয় না। ও টাকাটা বিন্দেকে দিও, খুশি হবে সে।

বাসুদেব চলে যাচ্ছিল, পিছু ডাকলো রাধা। বললে, আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা কি করলে?

বাসুদেব বললে, বেলা এগারোটায় ডিঙি আসবে—মোল্লাখালির লঞ্চঘাটায় পৌঁছে দেবে।

বাসুদেব চলে যেতে শিউলি বলে, এই ঝড়-বাদলে ডিঙিতে যাওয়া ঠিক নয়। আজকের দিনটা তো থাকলেই হতো?

রাধা বলে, না গো মোড়লগিন্নী, থাকলে আমাদের চলে না। কাল বাদে পরশুদিন যেতে হবে বনগাঁয়ে—তারপর সেখান থেকে ঝুলনে যাবো বৃন্দাবন। আমার বুড়ো বাবা সেখানেই থাকেন।

—মা নেই বুঝি?

—না। মা মরে যাবার পর বাবা কেমন যেন হয়ে গেলেন। রাধা চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।—আমার গানের গুরু আমারই মা বাবা।

অঙ্গ দুলিয়ে বিন্দে ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সস্তা আতরের উগ্র গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। এসেই বললে, আমার গা গতরে টাটানি রাধা, আমি আজ যেতে পারবো না। তারপর এই ঝড় বাদলে নোনা গাঙে যেতে আমার ভয়।

রাধা বলে, আমাকে আজ যেতেই হবে। তাছাড়া পরশু বনগাঁয়ে আসর, আজ না গেলে কি করে হবে।

—তুমি বরং বুড়ো ক্ষ্যাপা দাসকে নিয়ে যাও—আর বলরাম যাক—মনোহর আর আমি কাল সন্ধ্যের মধ্যে না হোক, পরশু সকালে বনগাঁয়ে পৌঁছে যাবো—বিন্দে আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলে শিউলির খাটের ওপর বসে বললে, আমি আজ যেতে পারবো না।

—ঠিক আছে, আমিই যাবো। রাধা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। বিন্দের সঙ্গে কথা বলতে তার অনিচ্ছা।

বেশ কিছুদিন থেকে বিন্দের সঙ্গে রাধার মন কষাকষি চলছে। রাধার ওপর দারুণ হিংসে বিন্দের। মনে মনে জ্বলে-পুড়ে মরলেও মুখে বড়

একটা কিছু বলে না। আসল হিসেবটা সে বোঝে। রাধা যদি তাকে সরিয়ে দেয়—তা হলে তার দাম কাণাকড়িও না। মনোহর আর বিন্দেকে রাধাই তো ক বছর পুষছে। যেমনই বায়না হোক, মাস গেলে বাংলা মাসের এক তারিখে ওদের দু জনকে আড়াই শ করে টাকা দেয়। এ ছাড়া বেশী আসর পড়লে বাড়তিও কিছু দেয়। তাতেও বিন্দের মন ভরে না।

রাধা চলে গেল ঘর ছেড়ে। যাবার আগে বলে গেল, আমি আজই যাবো বিন্দে। তোমার যা খুশি তাই করো।

বিন্দে লুটিয়ে পড়লো শিউলির খাটে। পাশ বালিশটা বুকে জড়িয়ে খাটের ওপর গড়াগড়ি খেয়ে বললে, আ, কি নরম বিছানা গো—এই বিছানা ছেড়ে কেউ যায়।

শিউলির সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় কথা শুনে। অথচ কিছু বলতেও পারে না। কাল রাতের ঘটনা তার কানে এসেছে। এই ধুমসি মাগীকে নিয়েই পলগাদার পাশে কাল লীলে' হয়েছে। তার স্বামী দেবতাটিও সেখানে ছিল।

নোংরা মেয়েমানুষটা তার বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে—দেখেও কিছু বলতে পারছে না সে। বললেই এখনই হয়তো একটা কেচ্ছা হয়ে যাবে বাড়িতে। বাড়িতে লোকজন, আত্মীয় কুটুম্ব—এ মেয়েমানুষেরা সব কিছু পারে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শিউলি। রাধা বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগছে তার।

শিউলি এসে দাঁড়ালো রাধার পাশে। বললে, একটা কথা বলবো- কিছু মনে করবে না তো ?

—বলো।

—তুমি ডিঙিতে যেয়ো না।

—তা হলে ?

—এখান থেকে তো সকালে হাসনাবাদের লঞ্চ ছাড়ে—সেই লঞ্চেই চলে যেয়ো। শিউলি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, আমার মন ভালো বলছে না।

রাধা হাসলো। বললে, তোমার কথা আমার মনে থাকবে মোড়ল বৌ।

শিউলিও হাসে। তার হাসিটা বড় করুণ। বলে, আমার কথা নাই বা মনে রাখলে।

কথার মধ্যে শিউলির চোখ পড়লো নীচে গোয়ালঘরের দিকে। যেখানে দাঁড়িয়ে গজেন হাত পা নেড়ে কি যেন বলছে এক জন মানুষকে। মানুষটাকে দেখেছে শিউলি। কিন্তু নাম জানে না। শিউলি আরো দেখলো, ছাতা মাথায়

দিয়ে বাসুদেবও গোয়াল ঘরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে টেকো মাথার সেইমানুষটা। যে মানুষটাকে দেখলেই সর্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলে ওঠে শিউলির। অথচ ওই শয়তান গোঁছের মানুষটাকে বাদ দিয়ে তার স্বামীর দিন চলে না।

আর ওপরে থাকলে চলবে না। একবার রান্না ঘরে যেতে হবে। যদিও রান্নার লোক আছে, কুসুম পিসি আছে—তবু তাকে একবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

নীচে যাবার আগে বলে গেল শিউলি, তার কথাটা যেন একবার ভেবে দেখে রাধা।

শিউলি যে মুখে গেল, সেই মুখেই ফিরে এলো। এসেই রাধার দুটি হাত ধরে বললে, আমার কথাটা শোনো—জীবন ঢালির ডিঙিতে তুমি যেয়ো না। ও এ-তল্লাটের জ্যান্ত যম।

—যমের দরজায় কাঁটা দিয়ে তবে আমরা ঘর থেকে বেরোই মোড়ল বৌ। অমন কতো যম আমি দেখেছি, রাধা বলে, আমি যমের ভয় করি নে। আর মরণ যদি কপালে থাকে, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

রাধা চলে গেল তার জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে। শিউলিও নেমে গেল রান্নাঘরের দিকে।

রান্নাঘরে ঢোকার মুখেই রাধা দেখলো বাসুদেব এদিকেই আসছে। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, শিউলি ডাকলো—শোনো।

বাসুদেব মাটির দিকে চোখ করে দাঁড়ালো।

রাধা অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, গোয়াল ঘরে ওই লোক দুটোর সঙ্গে কি কথা বলছিলে ?

বাসুদেব বলে, মোড়লবাড়ির পুরুষ মেয়েমানুষের এ সব কথার জবাব দেয় না। যাও—নিজের কাজ করো গে।

শিউলি বলে, ভেবেছো আমি কিছু বুঝিনে—সব বুঝি ?

বাসুদেব বলে, থাক আর শহুরে টানে কথা বলতি হবে না—

শিউলি ঝাঁঝালো স্বরে বলে, শহরের মেয়ে বিয়ে না করলেই তো পারতে—

আরো কিছু বলতো শিউলি, কুসুমপিসিকে দেখে চুপ করে গেল।

এ সংসারে এই কুসুম পিসিই শিউলির কাছের মানুষ। বাসুদেবের দূর সম্পর্কের পিসি, এ বাড়ির আশ্রিতা—সবাই তাকে করুণা করে, কিন্তু শিউলি সত্যি তাকে ভক্তি করে, পিসি বলে মানে। কুসুমও তাই সংসারের সব ঝড়-ঝাপটা থেকে আঁচল-আড়াল করে রাখে শিউলিকে।

বাসুদেবের সঙ্গে শিউলির কথা আড়াল থেকে শুনেছে কুসুম। সবই বুঝেছে সে। আর তাইতো সামনে ছুটে এসেছে কিছু না জানার ভান করে। এসেই বললে, তুই একবার আয় বৌ— রাধা বোষ্টুমী তো এখুনি যা হোক দু-মুঠো খেয়ে যাবে—করে দিতে হবে তো। ওর তো আবার নানান্ বায়নাক্কা—বলেছে ভাতে ভাত আর একটু দুধ খাবে। ভাত আমি চড়ায়ে দিচ্ছি বৌ—তুই একটু যা রান্নাঘরের দিকে।

বাসুদেব মুখ চোখ লাল করে চলে গেল ওপর ঘরে। আর শিউলি রান্নাঘরে গিয়ে ভাবতে বসলো, রাধা বোষ্টুমীর যাওয়া কি করে বন্ধ করা যায়। কিন্তু ভেবেও কোন পথ খুঁজে পেল না সে।

যদিও ঝড়ের দাপট কিছুটা কমেছে, কিন্তু বৃষ্টি তখনো মুষলধারায় চলছে। সেই দুর্যোগের মধ্যে রাধাবোষ্টুমীর দল রওনা হলো। বিন্দে গোঁ ধরে বসে রইলো। সেই সঙ্গে মনোহরও। রাধা যদিও তাকে মোক্ষম কথা শুনিয়ে বলেছিল, বিন্দে—আমি ভাবছি, তোমার শরীরে যখন কষ্ট সহ্য হয় না—তখন এমন আর কাউকে খুঁজে নিতে হবে যে আমার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে।

এর পরেও বিন্দে বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, রাধারে—কারো দিন কারো জন্যে চলে না। আমার সামনেও পথ খোলা আছে।

রাধা আর কোন কথা বলেনি। একশটি টাকা বিন্দের হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা রেখে দাও, আর বনগাঁয়ে আসরের কথা মনে রেখো। আমি যাচ্ছি।

—যাও। বিন্দে বলেছিল, এবারে আর সেই জঙ্গল পাহাড়ীর ডিঙি নয়—

পা বাড়াবার আগেই জঙ্গল পাহাড়ীর নামটা মনে করিয়ে দিয়েছিল বিন্দে। রাধাও ভেবেছিল, যদি যাবার আগে একবার সেই মানুষটার দেখা পেতো। কিন্তু কোথায় সেই মানুষ?

ডিঙিতে পা দেবার আগে রাধা একবার চারদিকে তাকালো। শূন্য গাও। একটি ডিঙিই শুধু ঘাটে বাধা—যে ডিঙিতে রাধা বোষ্টুমী মোল্লাখালি যাবে।

ডিঙির হালের মুখে বসে জীবন, দাঁড়ে বসে একজন জোয়ান ছোকরা। জীবনের স্যাঙাৎ বেঙাই। আর টেকো মাথার বানরমুখো মানুষটা ছই-এর ভিতরে।

ডিঙিতে ওঠার মুখে মানুষ তিনটেকে এক নজরে দেখলো রাধা। তার

বুকটা কেমন যেন অজানা ভয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তবু সে পা ফেললো ডিঙিতে। পায়ের কাদা গাঙের জলে ধুয়ে বসলো ছই-এর ভিতরে। বুড়ো ক্ষ্যাপা দাস আর গোবেচারা বলরামও উঠেছে।

ডিঙি ছাড়ার মুখে রাধা একবার জীবনকে জিজ্ঞাসা করলো, কটার লঞ্চ আমরা ধরতে পারবো মাঝি দাদা?

জীবন বললে, ভালোয় ভালোয় যাতি পারলে তিনটের লঞ্চ ধরিয়ে দেবানে।

রাধার কানে কেমন যেন বেসুরো লাগলো জীবনের কথা। বানরমুখো টেকো মানুষটার দিকে তাকাতে রাধার সর্বাঙ্গ ঘিন ঘিন করে উঠলো। মানুষটার চোখের চাউনি শয়তানের মতো।

ছই-এর মুখে বসে রাধা গাঙের এদিক ওদিক তাকালো। কাছে দূরে একটি ডিঙিও নেই। শূন্য ভরা গাঙ জুড়ে শুধু দুরন্ত ঢেউ নেচে বেড়াচ্ছে।

পুঁইজালির গাঙ যেখানে রায়মঙ্গলে মিশেছে, তারই বিপরীত দিক থেকে বেরিয়ে গেছে বাঘনার গাঙ। জায়গাটা যেমন চওড়া, তেমনি ভয়ংকর। ঢেউ নয়তো—যেন একটির পর একটি ভয়ংকর দৈত্য তেড়ে আসছে। এপার ওপার স্পষ্ট চোখে পড়ে না—আর এখন তো প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেছে।

ছই ঠেস দিয়ে রাধা বসেছিল। কখন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—আচমকা ডিঙিটা টালমাটাল করে উঠতে সিধে হয়ে বসলো।

বানরমুখো মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে মড়াদেঁতো হাসি হেসে বললে, কি গো—সুন্দরী, ভয় করছে?

রাধার আপাদমস্তক জলে উঠলো কথা শুনে। কিন্তু কিছু বললে না। আর সেই মুহূর্তে সে লক্ষ্য করলো, হালের মাঝির চোখ দুটো কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠেছে।

রাধার বুকটা কেঁপে উঠলো। মনে পড়লো মোড়ল-বৌ-এর কথা। তাছাড়া আরো ভাবনা যোগ হলো তার মনে। কাল রাতে বিন্দে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী করেছিল, তারপর আজ সে এলো না—নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে।

আজ না এলেই ভালো হতো—এখন মনে হচ্ছে রাধার। কিন্তু এসেছে যখন, তখন তো আর ফিরে যাবার পথ নেই।

রাধা গাঙের বুকের দিকে চোখ রাখে। আর এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে একটি মানুষের কথা। যার নাম জঙ্গল পাহাড়ী।

কখন ডিঙি পারের মাটিতে ভিড়েছে খেয়াল করেনি রাধা। দেখলো পারের মাটিতে ঘাট-চালায় দাঁড়িয়ে আছে দুটি মানুষ। বাসুদেব মোড়ল আর গজেন।

পারের কাছে ঢেউ আরো বেশি। ডিঙি এমন দুলছে, এই বুঝি উলটে যায়।

জীবন ডাকলো, কই গো মোড়ল এসো।

রাধা ফুঁসিয়ে ওঠে, তোমাদের মতলব কি বলো তো?

বানরমুখো মড়াদেঁতো মানুষটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাসে।—এখনো বুঝতি পারো নি। বাসুদেবের নজর যার ওপর পড়ে, সে কি এমনিতে পার পায়। তোমার গান শুনেছিল ও দু বছর আগে সাতজেলের রাসের মেলায়—সেই থেকে ওর মনের মধ্যে তুমি ছিলে—এবারে তাই মায়ের ছেরাদ্দ দিতে তোমারে নে এলো। বাসুদেব মোড়ল হিসেব করে চলে। দেখতিছো না—অ আগেভাগে এসে দাঁড়িয়ে আছে মালোপাড়ার ঘাটে।

রাধা উঠে দাঁড়ালো। সেই সঙ্গে ক্ষ্যাপা দাস আর বলরাম।—ডিঙির মুখ ধরো মাঝি, আমরা নেমে যাবো।

—নামবা কোথায়? ডিঙিতে জীবন ঢালি, ডাঙায় বাসুদেব মোড়ল—বাঘ আর সাপ—বলে মড়াদেঁতো বিশ্রী শব্দ করে হাসতে থাকে।

রাধার চোখে অন্ধকার নামে। ক্ষ্যাপাদাস বুড়ো হলেও রুখে ওঠে। আর গোবেচারা বলরাম তো হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

বাসুদেব আর গজেন উঠে এসেছে ডিঙিতে। রাধা তবু একবার ডাঙার এদিক-ওদিক ফিরে চায়। জনপ্রাণী নেই। প্রবল বর্ষণের মধ্যে কে আর পথে বেরুবে।

আবার ডিঙি ভাসলো। বাসুদেব বসেছে প্রায় রাধার মুখোমুখি। রাধা মুখ ফিরিয়ে আছে। মড়াদেঁতোর চোখ দুটো জ্বলছে। বুড়ো ক্ষ্যাপা দাসের কোলের কাছ থেকে খোল নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করেছে গজেন।

গজেন খোলে চাটি মারতে মারতে বলে, কি গো কীত্যনে—একটা রসের গান ধরো না।

রাধা আগুন-জ্বালা চোখে ফিরে চায় গজেনের মুখের দিকে।

বাসুদেব মৃদু ধমক দেয় গজেনকে। গজেন চুপ করে যায়। আর রাধা তখন গহীন গাঙের দিকে চেয়ে ভাবে, এ জলে ঝাঁপ দিলে কেমন হয়।

কিন্তু মরতে তার বড় ভয়। বাবার একটা কথা তার মনে আছে এ জীবন বাঁচার জন্যে, মরার জন্যে নয়।

বাবার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাও মনে পড়লো রাধার। মা নেই। মায়ের বিরহে বাবা চলে গেছেন বৃন্দাবনে। এবারে যদি নিজেকে বাঁচাতে পারে, সব ছেড়েছুড়ে বাবার কাছে বৃন্দাবনে গিয়েই দিন কাটাবে রাধা। যমুনার ঘাটে বসে কীর্তন গাইলেও দিন চলে যাবে।

বৃষ্টি সমানে ঝরছে। ঝড় কমে গিয়েছিল, আবার দমকা বাতাস ছুটে এলো। পাগল হলো বর্ষার ভরা গাঙ। ডিঙি টালমাটাল করে উঠলো। জীবন উঠে দাঁড়িয়ে হাল ধরেও ডিঙি সামলাতে পারছে না। বেণ্ডাই দাঁড় টানা বন্ধ করে ঠক ঠক করে কাঁপছে। আর মানুষগুলোরও মুখের রঙ কালো হয়ে গেছে।

কিন্তু রাধা হাসছে। আরো ঝড় উঠুক, আরো তুফান উঠুক—ডুবে যাক ডিঙি।

মড়াদেঁতোর হাসি মিলিয়ে গেছে। সে-তো ভয়ে প্রায় কেঁদেই ফেলে আর কি। আর জীবন শক্ত হাতে হাল ধরেও ডিঙি সামলাতে পারছে না। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। পারের মাটি অনেক দূর—কাছাকাছি একটা কিস্তি কিংবা গহনার নৌকো পেলেও খানিকটা ভরসা ছিল—কিন্তু শূন্য গাঙ।

দূরে বাঘনার গাঙ বরাবর নজর পড়লো জীবনের। একটা ডিঙি বোধহয় পারঘুমটির দিক থেকে এদিকেই আসছে।

একটু অসতর্ক হতেই ডিঙি বিশ্রীভাবে দুলে উঠলো। 'মলম' উপচে খানিকটা জলও উঠলো। জীবন দেখলো আকাশের দিকে চেয়ে। তারপর একবার চীৎকার করে উঠলো, তোমার পাপে বোধহয় আমরা সবাই যাবো।

বাসুদেবের কথা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। সে শুধু একবার জীবনের মুখের দিকে তাকালো।

দূরের ডিঙি জোয়ারের টানে তীরের মত ছুটে আসছে। এই ঝড়-বাদলের মধ্যে অমন হালকা ডিঙি নিয়ে কে আসছে। জীবনের মত ডাকসাইটে মরদ যেখানে হাল ধরে ডিঙি সামলাতে পারছে না—সেখানে অমন কুশলী মাঝি কে?

কাছে এলো দূরের ডিঙি। ডিঙির মাঝখানে দাঁড়িয়ে জঙ্গল পাহাড়ী। পিঠে তার গাদাবন্দুক নল উঁচিয়ে রয়েছে। আর হাল ধরেছে ওসমান মিয়া।

দাঁড়ে বসে দু'জন—বদন আর কালু গাজী। জঙ্গলের পাশে তালপাতার টোকা মাথায় অন্ত বাউলিকেও দেখতে পেল জীবন।

—এ্যাই শূয়োরের বাচ্চা, 'হাঁকার' দিল জঙ্গল। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তার 'হাঁকার' বাজের মত বেজে উঠলো।

গাদা বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলো জঙ্গল। দাঁড় থেকে উঠে এসেছে কালু। হাতে তার উদ্যত বল্লম।

তীরের মতো জঙ্গলের ডিঙির মুখ এসে ছুঁচের মতো বিঁধলো জীবনের ডিঙির ছই-এ। ডিঙি ওলটাতে ওলটাতে কোন রকমে রক্ষে পেল। আর বেঙাই তো ভয় পেয়ে জলে ঝাঁপ দিলে। ওসমান সঙ্গে-সঙ্গে ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে বেঙাই-এর চুলের মুঠি ধরে তার ডিঙিতে তুলে নিলে। বেঙাই পা জড়িয়ে ধরলো জঙ্গলের। জঙ্গল পায়ের ঝাপটায় তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়লো জীবনের ডিঙিতে। গাদা বন্দুকের নল দিয়ে আঘাত করলো জীবনের মাথায়। দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, বকেয়া হিসেবটা আজই মিটুক—কি বলিস?

জীবন কথা বলবে কি, বে-টক্কর মার খেয়ে হাল ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। তা ছাড়া এটাও সে বোঝে, কতকগুলো ভেড়া নিয়ে জঙ্গল আর ওসমানের দলের সঙ্গে লড়া যায় না।

জীবনের তলপেটে সজোরে লাথি মারলো জঙ্গল। জীবন লুটিয়ে পড়লো ডিঙির মাথায়। তারপর এগিয়ে গেল ছই-এর ভেতরে। মড়াদেঁতো মানুষটার গালে বিরাশি সিক্কার চড় কষিয়ে বাসুদেবের ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে তার থুঁতনি নেড়ে বললে, কি গো—ন্যাড়া মাথায় চুল গজালো না—এরই মধ্যে ফুর্তির চিন্তা। বলিহারী দেই মোড়লের পো-ঘরে বৌ থাকতি মেয়েমানুষ নে টানাটানি। এবারে চলো চাঁদ, ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে তোমারে মোকাম ঘোরাই গে।

বাসুদেবের মুখে কথা নেই। গজেন ভয়ে কাপড়ে পেচ্ছাব করে ফেলেছে। আর রাধার দু চোখে তখন জল টলমল করছে। জল ভরা চোখে তাকিয়ে আছে জঙ্গলের মুখের দিকে।

পাশাপাশি দুটি ডিঙি এসে ভিড়লো পাররুমটির ঘাটে। প্রথমে ডাঙায় নামলো অন্ত বাউলি। তারপর সেই হাত বাড়িয়ে রাধাকে ডাঙায় তুললো। অন্তর মুখে আনন্দের হাসি। তার কোটরে ঢোকা দুটি চোখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এবারে ওসমান তার বলিষ্ঠ মুঠোয় চেপে ধরে জীবনের হাত। বলে, তোর জন্যে এই বুড়ো বয়েসে আবার গাঙে নামলাম দুষমন ঠেঙাতে। হারামজাদা—কতো টাকা দেছে তোরে মোড়লের পো।

জীবন বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে। এমন বে-কায়দায় কখনো সে পড়ে নি। মড়াদেঁতো মানুষটা এবারে নীচে নামতে যায়। আর নামার মুখেই তাকে কাদার মধ্যে ঠেলে দেয় জঙ্গল। এক হাঁটু নরম কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে মড়াদেঁতো। চোখ-মুখে, সর্বাঙ্গে কাদা লেপটে যায়। সেই অবস্থায় উঠে দাঁড়াতে চায়—আবার হাল দিয়ে ঠেলে দেয় জঙ্গল। বলে, ভালো করে কাদা মাখ—এখনো তোর হয়েছে কি। হিজড়ে নে ঘর করা মানুষ—তার আবার চাঁদের আলোয় যাবার ইচ্ছে—বলে মড়াদেঁতোর মুখে থুতু গায়ে ছিটিয়ে দেয় জঙ্গল।

গজেন রীতিমত বেসামাল হয়ে পড়েছে। জঙ্গলের পা জড়িয়ে ধরে বলে, আমারে ছাড়ান দে জঙ্গল। তোর মা'রে আমি মাসি বলে ডাকি।

—ভেড়ার গায়ে হাত দেয় না জঙ্গল। নে, যা বলি তাই কর—মোড়লের কান ধরে ডাঙায় নামা।

গজেন ইতস্তত করে। আর বাসুদেবের মোড়ল-রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বলে, জঙ্গল ভুলে যাসনে আমার নাম বাসুদেব।

জঙ্গল ডাক দেয় ওসমান চাচাকে— চাচা, মোড়লের পো আবার কথা বলছে।

—বলতে দে। ওসমান বলে, ডাঙায় নামিয়ে নে ওদের—তারপর বলিস ওরে বাপের নাম করতে।

জঙ্গল এবারে ধমকে ওঠে গজেনকে।—নে, ওর কান ধর। মোড়লের পো-র নোংরা গায়ে আমি হাত দেবো না।

গজেন হাত বাড়িয়েও পিছিয়ে এলো। বাসুদেব শাসালো, খবরদার গজেন।

—এ্যাই গজেন, জঙ্গল তেড়ে উঠলো, এবারে কোঁত্‌কা খাবি।

যদিও গজেনের হাত কাঁপলো, তবু তার একটি হাতের দুটি আঙুল বাসুদেবের কানে গিয়ে পৌছলো।

জঙ্গল উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। বললে, কিগো মোড়লের পো—বাড়ি গে গজারে একপেট মিষ্টি খাইয়ো—বুঝেছো।

বাসুদেবের মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। জঙ্গল বলে, যা- নীচে নাম।

বাসুদেব নামতে যাবে, এমন সময় দু পায়ে ডিঙি দুলিয়ে দিলে। জলকাদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাসুদেব। তার ঘাড়ের ওপর গজেন। জঙ্গল আবার গলা ফাটিয়ে হাসলো।

বাসুদেব আর গজেন জড়াজড়ি করে কোনোমতে ডাঙায় উঠলো। অন্ত বাউলি আগেভাগে উঠেছে রাধাকে নিয়ে। ক্ষ্যাপাদাস, আর বলরাম ওপরে উঠে ঘাট চালায় আশ্রয় নিয়েছে। বাসুদেব আর গজেন ঘাটচালায় ঢুকতে যাবে, বাধা দিল রাধা।—তোমরা এখানে ঢুকো না। এক ছাউনির নীচে দাঁড়াতেও গা ঘিনঘিন করছে।

বাসুদেব আর গজেন ঘাটচালায় না ঢুকে ওড়চাকা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইলো।

এক এক করে সবাই নেমে এসেছে। ডিঙি বাঁধা রইলো ঘাটে। এবারে জঙ্গল ডাক ছেড়ে বলে উঠলো, মোড়লের পো—থির হয়ে দাঁড়াও—যাতি হবে তোমার বাড়িতে। জঙ্গল পাহাড়ী তোমারে ঘরে পৌঁছে দে আসবে।

বাসুদেব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জঙ্গল এবারে ঘাটচালায় এসে রাধার মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, চিনতে পারো আমারে ?

রাধার দু চোখে নতুন করে জল ভরে আসে। কথা বলতে পারে না। একবার জঙ্গলের চোখে চোখ রেখে দৃষ্টি মাটিতে মেশায়।

পারঘুমটি থেকে যোগেশগঞ্জ। অনেকখানি পথ। বৃষ্টিতে পিছল ভেড়িপথ। পা বাড়ানোই দায়। ওসমান একবার বলেছিল, ওদের চুলকুনি মাঠো হয়েছে—এখেন থেকে ছাড়ান দেও। ঘরে গে গা গরম করুক গে সব।

কিন্তু জঙ্গলের তাতে আপত্তি। এত বড়ো পাপের কথাটা দেশের লোক জানুক—দিনদুপুরে এই রকম কাজ—বাপের জন্মেও শুনিনি। চাচা তোমারেও যাতি হবে আমাদের সঙ্গে। যাবা তো ?

—তা না গেলে কি হবে। ওসমান বলে, চল।

অন্ত বাউলি বলে, কিন্তু মা লক্ষ্মী যাবে ক্যামনে।

রাধা বলে, আমি ঠিকই যেতে পারবো। যেতে আমাকে হবেই !

একটা বিড়ি ধরালো জঙ্গল। বার কয়েক টান দিয়ে ফেলে দিলে। ভালো লাগছে না বিড়ি টানতে। গাদা বন্দুকটাকে বগল দাবায় নিলে। তারপর মড়াদেঁতোকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে, চল সব লাইন বেঁধে।

এই সময়েও অস্তর রসিকতা। বললে, আরে বাউলি না হলি পথ দেখাবে কেডা। আমিই আগে যাচ্ছি।

পারঘুমটির গাঙপার থেকে পূবের ভেড়িপথ ধরে গ্রামের মধ্যে এলো এরা। ইতিমধ্যে কোত্থেকে যেন খবর ছড়িয়ে পড়েছে—কিছু কিছু কৌতুহলী মানুষ আসতে আরম্ভ করেছে ব্যাপারটা দেখতে জানতে। এ তল্লাটে সাধারণ মানুষ জঙ্গল আর ওসমানকে দেবতার মতো 'মান্যি' করে। অনেকে দেখতে এসে সঙ্গ ধরলো। বাসুদেব আর জীবন ঢালির কুকর্মের কথা সবাই জানে. কিন্তু এমন-তরো ঘটনা যে চোখে দেখা যাবে—এ ভাবনা-চিন্তার বাইরে। যে দেখলো, যে শুনলো—সেই ছি ছি করলো। অনেকে দেখেশুনে ফিরে গেল অনেকে সঙ্গে চললো।

পারঘুমটি, গোবিন্দকাটি, শ্রীধরকাটি, আরো তিন-চারটি গ্রাম পেরিয়ে যখন বাসুদেবের বাড়ির উঠোনে ওরা পৌছলো, তখন ঘরে ঘরে সন্ধ্যের শাঁখ বাজছে।

মোড়লবাড়িতেও তখন রীতিমত ভীড়। বাসুদেবের সাকরেদরাও দল বেঁধে এসেছে। অনেকে তো কোমর বেঁধেই এসেছিল—কিন্তু জঙ্গলের ভয়ংকর চেহারা, আর সঙ্গে ওসমান মিয়াকে দেখে সবাই পিছিয়ে গেল। তারপর জীবন তো মাথা আর তলপেটের যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে পড়েছে। এ-ছাড় রয়েছে অস্ত বাউলি, যাকে এ তল্লাটের লোক সমীহ করে। অনেকেরই বিশ্বাস বাউলি ইচ্ছে করলে 'মন্তর-তন্তরে' ভেড়া বানাতে পারে মানুষকে। ও নাকি 'কামিখ্যের পিশাচ সিদ্ধ'।

মোড়ল-বৌ শিউলি লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে পাগলের মতো ছুটে এলো উঠোনে। রাধাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

বাসুদেবের পুরুষ-সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।—ঘরের বৌ বাইরে কেন? যাও!

—যাবো, যাবো—একেবারেই যাবো। শিউলি পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগলো, আজ আমার কতো আনন্দ—

শিউলিও যতো কাঁদছে, রাধাও ততো কাঁদছে। জড়ো হওয়া শ তিনেক মানুষ এ দৃশ্য দেখে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে।

বাসুদেব তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। এবারে জঙ্গলের কি মনে হয়, বলে—যাও, জল-কাদা ধুয়ে ফ্যালো গে—আমরা চললাম।

রাধাকে ডাকে অস্ত বাউলি। বলে, চলো মা লক্ষী—গরীবের কুঁড়েয় একটা রাত কাটাতে।

শিউলি ছাড়তে চায় না রাধাকে। বলে, তুমি যেয়ো না—যদি যাও আমারে নিয়ে চলো· এখানে বাঁচবো না।

রাধা মুছিয়ে দেয় শিউলির চোখের জল।—মরণের কথা ভাবতে নেই যে—বাঁচার কথা ভাবতে হয়। জীবনের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। যাও।

—কিন্তু আমার স্বামী যে—কথা শেষ করতে পারে না শিউলি। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কুসুমপিসি আসে এবারে। শিউলিকে একরকম টেনে নিয়ে যায়।

জঙ্গল ফিরে চায় চারদিকে। এখনো টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির মধ্যেও ভিড় করে আছে অনেক লোকজন। জীবন দাঁড়িয়েছিল তলপেটে হাত দিয়ে। তার কাছে গেল জঙ্গল। বললে, কি রে—বকেয়া হিসেব মিটলো—না এখনো মুখোমুখি হবার ইচ্ছে আছে ?

জীবন বলে, এই জন্যেই বুঝি আমাকে বাঁচায়ে রাখলে ?

জঙ্গল বলে, জঙ্গল পাহাডী খুনী নয় রে, নয়তো তোরে গাঙে ফেলে দিলে তো কামট কুমীরে হজম করে নিতো। যা—ডিঙি নে তোর বাড়ি যা।

জীবন চুপ করে থাকে। জঙ্গল একবার জীবনের চোখে চোখ রেখে বলে, আমার চোখের দিকে তাকায়ে দ্যাখ—কি দেখিস ?

জীবন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, জঙ্গল তার চুলের মুঠি ধরে ঝটকা দিয়ে বলে, আমি চললাম রে জীবন—

বাসুদেব তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। শুকদেব এসে টেনে নিয়ে গেল তার দাদাকে। মড়াদেঁতো আর গজেন কখন যেন গুটিগুটি সটকান দিয়েছে। ভিড় করা মানুষগুলো এক এক করে চলে যাচ্ছে। মোড়লবাড়ির কেচ্ছার মধ্যে বেশী সময় দাঁড়ানো ঠিক নয়। বাসুদেবকে সবাই জানে, সে তার বাপের ওপরে যায়। কখন কার ওপর বিষদৃষ্টি পড়বে, তার ঠিক নেই। পড়লে তার ভিটেয় ঘুঘু না চরিয়ে ছাড়বে না।

জলঙ্গও আর দাঁড়ালো না। দলবল নিয়ে সে চললো তার বাড়ির দিকে। যাবার আগে জীবনকে মনে করিয়ে দিলে· যে পারঘুমটির ঘাটে বাঁধা তার ডিঙি। যখন খুশী নিয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গেও আসতে পারে সে। আর তাকে মারধোর করবে না। কুত্তার বাচ্চা একদিনে বেশী লাথি হজম করতে পারে না।

জীবনরে দিক থেকে কোনো কথা শোনা গেল না। জঙ্গল-ওসমানের দল এগিয়ে চললো পিছল পথ ধরে।

একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ালো নারীকণ্ঠের ডাক শুনে। —রাধারে, আমারে ফেলে যাসনে।

বিন্দে আসছে ছুটতে ছুটতে। আলুথালু তার বেশবাস। পিছনে টলতে টলতে আসছে মনোহর। ঠিক মতো পা ফেলতে পারছে না।

থমকে দাঁড়ায় রাধা। সেই সঙ্গে সবাই। বিন্দে ছুটে এসেই রাধার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। বলে, তুই আমার চেয়ে ছোট, তবু তোর পায়ে ধরে বলি—আমারে ক্ষমা কর তুই।

রাধা বলে, ওঠ বিন্দে। আমার আর ক্ষমা—রাধা বোষ্টুমী আর কীর্ত্তন গেয়ে বেড়াবে না। যদি পারি বনগাঁয়ে যাবো—ওই আমার শেষ আসর। তারপর ঝুলনে বৃন্দাবনে চলে যাবো বাবার কাছে—জানি না, তারপর কি হবে। তবে গানের বেসাতি আর করবো না। আমি যাচ্ছি বিন্দে—আর আমি দাঁড়াতে পারছি নে।

রাধা চলে গেল। চলে গেল জঙ্গল পাহাড়ীর দল। মোড়লবাড়িতে যারা জমা হয়েছিল, তারাও এক এক করে চলে গেল। শুধু মড়াদেঁতো মানুষটা মাতাল মনোহরের গলা জড়িয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ করে হাসতে লাগলো।

ছোট মোড়ল শুকদেব এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। হাতে তার শঙ্কর মাছের চাবুক। মড়াদেঁতোকে ধমকে উঠলো, বেরিয়ে যাও এ-বাড়ি থেকে—এ শয়তানী মতলব তোমার। দাদারে তুমি পথে বসাতে চাও। তোমারে আমি চিনিনে—যাও।

মড়াদেঁতোর লজ্জা নেই। সুর করে বলে, যার জন্যে করে মরি—সে দেয় আমার গলায় দড়ি।

শুকদেব বারান্দা থেকে লাফিয়ে নীচে নামে। চাবুক আস্ফালন করে বলে, যাও, এ বাড়িতে তোমার যেন ছায়া না পড়ে।

—ছোট মোড়ল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে বাপধন—আমি বুঝি কিছু বুঝিনে, মড়াদেঁতো চীৎকার করে বলে, জঙ্গল পাহাড়ীরে খবর দিয়েছিলে তুমি।

—এ্যাই শয়তানের বাচ্চা, শুকদেব সজোরে চাবুক মারলো মড়াদেঁতোর পিঠে।—কালনেমীর বাচ্চা, ঘরে আগুন জ্বালাতে এয়েচো—

মড়াদেঁতো ছুটে পালালো। যাবার আগে চীৎকার করে বলে গেল, বড় মোড়ল জানুক—তার ছোট ভাই-এর কীর্তি।

শুকদেব চাবুক নিয়ে ছুটে গেল। মড়াদেঁতো পিছল পথের ওপর দিয়ে

ছুটতে পা হড়কে পড়লো পাশের জোলে শুকনো বাবলা কাঁটার মধ্যে। এদিকে মোড়ল বাড়ির ভয়ংকর কুকুরটা তেড়ে গেল জোলের দিকে।

এ-সব ঘটনার পরেও মোড়ল বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজলো। তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাতে এলো কুসুমপিসি।

॥ সাত ॥

বাঘনার গাঙে এখন ভরা জোয়ার। জল টলমল করছে। নির্মেঘ আকাশ। বাতাসও নেই। শান্ত গাঙ। শুধু ছোট ছোট ঢেউ খেলা করছে।

গাঙের ওপারে বাদাবন। এ পারে আবাদ। জোয়ারের জল বাদাবনের খানিক ভাসিয়ে দিয়েছে। খাড়ি পথে জল ঢুকেছে বাদাবনের ভিতর।

সকালে জঙ্গল আর দ্বিজু ভাঁটার টানে ডিঙি ভাসিয়ে ছিল দক্ষিণে সমশের-নগরে। পারঘুমটির ঘাট থেকে ভাড়া পেয়েছিল সে। দেবেন মাষ্টার তার বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সমশেরনগরে। পারঘুমটির কুটুমবাড়ি এসেছিল ওরা।

দেবেন মাষ্টার না খাইয়ে ছাড়েনি। বলেছিল, না খেয়ে কি যেতে আছে। তোমার মতন মানুষকে খাইয়ে আনন্দ। এসো, যা হোক দুটো রান্না হোক —তাই খেয়ে তারপর যাবে। তাছাড়া জোয়ার না লাগলে তো যেতে পারছো না।

ঘরে পৌঁছেই গুড়মুড়ি খাওয়ালো দেবেন মাষ্টারের বৌ। তারপর চালের আড়ায় ঝোলানো জালগাছটা বার করে জঙ্গলের হাতে দিলে দেবেন মাষ্টার। বললে, তুমি যদি পারো, দুটো খ্যাপোন মেরে দ্যাখো পুকুরে।

—এ আর না পারার কি আছে। জঙ্গল জালগাছটা কাঁধে ফেলে উঠে দাড়ায়। —চল দ্বিজু—দেখি মাষ্টার কেমন মাছ পুষেছে পুকুরে।

বাড়ির সামনেই পুকুর। বর্ষায় জলে টইটম্বুর। পরনের কাপড় ছেড়ে গামছা পরলো জঙ্গল। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে জাল ফেললো। এক খ্যাপানেই কাজ শেষ। জাল ফেলেই জলে নেমে ঘাই চাপলো জঙ্গল। জলে বুদবুদ উঠছে। ঘাই চেপে আস্তে আস্তে জালে টেনে নিলে।

বেশ বড় একটা রুই মাছ, আর ছোট একটা কাতলা পড়েছে। কাতলাটাকে ছেড়ে দিয়ে রুই মাছটাকে রাখলো জঙ্গল। ছটফট করছে মাছটা। মাটিতে একটা আছাড় মেরে ঝিন্তুকে বললে, নে যা। আমি একেবারে চান করে যাই।

— তেল মাখবা না ?

—তুত্তোর নিকুচি করেছে—এখন আবার তেল মাখতে বসি, বলে জলে ঝাঁপ দিল জঙ্গল।

মনের আনন্দে বেশ খানিক সময় সাঁতার কাটলো পুকুরে —তারপর গা মাথা মুছে ফিরে এলো।

মাদুর পাতা ছিল ঘরের দাওয়ায়, টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো জঙ্গল। যেমন শোয়া, তেমন ঘুম। ঘুমের মধ্যে নাক ডাকতে লাগলো। নাসিকা গর্জনের শব্দে দেবেন মাষ্টারের ছেলেমেয়েরা এলো মজা দেখতে। ভীমের মতো দশাসই জঙ্গল চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে আছে, আর ঘুমের মধ্যে নাক ডাকছে ভয়ংকর শব্দে। ছেলে-মেয়েরা মজা পেয়ে বসে গেল ঘুমন্ত মানুষটার কাছে।

করিৎ-কর্মা মেয়েমানুষ দেবেন মাষ্টারের বৌ। দুটো উনুন জেলে মাছের ঝোল ভাত রান্না করে ফেললো। জঙ্গল তখনো ঘুমিয়ে আছে।

দেবেন মাস্টারের ডাকে ঘুম ভাঙলো জঙ্গলের। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে ঘুমিয়ে। ছাঁচ তলায় জলের কলসি ছিল, চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া চুলগুলো পিছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসলো জঙ্গল।

এক লাইনেই খেতে বসলো সবাই। দেবেন মাস্টারের বৌ পরিবেশন করছে। ভাত আর কচু দিয়ে মাছের ঝোল। মাছটায় ডিম হয়েছিল, সেগুলো মুন লঙ্কা দিয়ে ভেজেছে।

মাছেব মুড়োটা জঙ্গলকে দিয়েছে। জঙ্গল বলে, এটা আমারে কেন ?

দেবেন মাস্টার বলে,—আরে খাও দিকিনি—তুমি খাইয়ে মানুষ, তোমারে খাইয়ে আনন্দ ! খাও।

জঙ্গল বেশ খোশ মেজাজেই খেতে আরম্ভ করলো। কিলোখানেক চালের ভাত, আর সেই হিসেবে তরি-তরকারি—তৃপ্তি করেই খেলো জঙ্গল। খাওয়া-দাওয়ার পর পান চিবিয়ে একটা বিড়ি ধরালো। তারপর সেই মুখেই উঠে দাঁড়ায়।

জোয়ারের টান লেগেছে গাঙে। এই জোয়ারেই ডিঙি ভাসিয়ে পৌছতে হবে পারঘুমটি।

বাদাবনের ধার দিয়েই ডিঙি নিয়ে চলেছে জঙ্গল। দ্বিজু দাঁড় টানছে, আর জঙ্গল বসেছে হালের মুঠি ধরে। জঙ্গলের চোখ কখনো বাদাবনকে স্পর্শ করছে, কখনো ভরা গাঙের দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। কখনো নীল আকাশে ভেসে যাওয়া পানকৌড় কিংবা কুঁজবকের দলকে দেখছে।

কোথাও কিছু নয়, রাধাকে মনে পড়লো জঙ্গলের। রাধার মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মনের মধ্যে। শ্যামলা রঙের মেয়ে চোখটা বাখনার গাঙের মতো গভীর· আর সে চোখে যেন কী এক মায়া আছে। যাবার আগে বলে গেছে রাধা— যদি কখনো এ-দেশে আসি তোমার জন্যেই আসবো।

জঙ্গল হেসে বলেছিল, আমার মধ্যে কি দেখেছো তুমি ?

রাধা অনুচ্চকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল, সেটা নাই-বা বললাম। যে কথাটা আমার কথা, তা আমারই থাক।

রাধা চলে যাবে। বৃন্দাবনে, তার বাবার কাছে। বলে গেছে সেখানেই থাকবে। জঙ্গল বাইরের জগতের হিসেব জানে না। সুন্দরবন ছেড়ে কতটুক বাইরেই বা সে গেছে। উত্তরে বসিরহাট, পশ্চিমে ডায়মণ্ডহারবার পূবে রায়-মঙ্গলের স্রোত ধরে সাগর পর্যন্ত। একবার কলকাতা গিয়েছিল। কালীঘাটে। কত বার মনে করেছে, বাপ-ঠাকুর্দার দেশটা একবার দেখে আসবে—কিন্তু আজও যাওয়া হয়নি যতবার মনে করেছে যাবে, ততবার মা বাদ সেধেছে— ওদেশে যাসনে তুই। ওদেশের বাতাসে তুই নিঃশ্বেস নিতে পারবি নে।

কিন্তু একবার যাবে জঙ্গল, বাপ-ঠাকুর্দার দেশটা দেখে আসবে। ঈশ্বর পাহাড়ী, তস্য পুত্র দুর্জয় পাহাড়ী, তস্য পুত্র জঙ্গল পাহাড়ী —

রাধার কথা মন থেকে হারিয়ে যায়। রক্তে জোয়ার আসে জঙ্গলের। ডানদিকে মরিচঝাপির বাদা—ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে বাদাবনের খাড়ির দিকে চলে জঙ্গল।

দ্বিজু বসে আছে দাড়ে। বলে, করো কি· এখন কি বাদায় যাবা নাকি ?

জঙ্গল বলে, চল না একটু ঘুরে আসি— কদ্দিন বাদায় যাইনে বল তো ?

দ্বিজু বলে, তোমার কি মাথা খারাপ হলো। বাদায় যাবা কি করতি ?

জঙ্গল বলে, কিছু করতি নয় রে—একটু দেখে আসি। জানিস, বাদা দেখলি আমার মনটা ভরে যায়।

জঙ্গলের জিদই বজায় রইলো। খাড়ি মুখে ঢুকলো জঙ্গল। উজান বেয়ে খানিক দূর গেল। চেয়ে চেয়ে দেখলো বাদাবনের দিকে। গেঁয়ো, কেওড়া, গরান আর হেতালের ঝোপ দেখলো। দেখলো কাংড়া গাছের সুন্দর পাতা— দেখলো কাঠশোলা, গুড়া, গুড়চাকা আর পিটুলি গাছগুলোকে।

এক জায়গায় ক্যাওড়া ডাল নুইয়ে পড়েছিল মাথার ওপরে। খোকা খোকা ক্যাওড়া ডাল-সমেত ভেঙে নিলে খানিক। তারপর আবার ফিরে চললো গাঙের দিকে।

সূর্য ডুবছে। বাদা অঞ্চলের গাছের শাখায় শাখায় রক্তিম আলোর স্পর্শ। নীল আকাশে ভেসে যাওয়া পেঁজা তুলোর মতো মেঘের গায়ে সূর্যাস্তের আবীর মাখানো। দূরের পাখিরা দল বেঁধে ফিরে চলেছে নীড়ে। জঙ্গল শিথিল মুঠোয় হাল ধরে আছে। দৃষ্টি তার বারবার আসন্ন সন্ধ্যার আকাশকে ছুঁয়ে ফিরে আসছে জোয়ারে পূর্ণ গাঙের দিকে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় গাঙের বুকে ও রঙের আলপনা।

জঙ্গলের চোখে রঙের স্বপ্ন। এমন করে কোনোদিন রঙকে ভালোবাসেনি সে। এমন করে কোনদিন তার মন শান্ত-চিন্তায় ভরে ওঠেনি।

সন্ধ্যা নামলো। সন্ধ্যার আকাশে উঠলো চাঁদ। আর কদিন বাদেই পূর্ণিমা। ঝুলন যাত্রা।

ঝুলনে রাধা থাকবে বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের কথা শুনেছে জঙ্গল। ঠাকুর ঠাকুরের লীলা-ভূমি। এক-একবার ইচ্ছে হয়, মাকে নিয়ে বৃন্দাবনে যাবে সে। সঙ্গে থাকবে অন্ত বাউলি। বাইরে বেরোনো অভ্যেস আছে অন্ত'র। ঠিক-ঠিক নিয়ে যাবে বৃন্দাবনে।

কিন্তু এ ভাবনা মনের মধ্যে পাকা হতে পারে না। এই মুহূর্তের ভাবনা পরমুহূর্তে হারিয়ে যায়। জঙ্গলের পুরুষ-রক্ত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। না— একজন মেয়েমানুষের জন্যে সে কোনোদিন কাঙাল হতে পারবে না। সে ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি, দুর্জয় পাহাড়ীর ছেলে। যাদের রক্তে ছিল ভয়ঙ্করের নেশা।

– না, না—কতকটা চীৎকার করে উঠলো জঙ্গল। নিজের চীৎকারে নিজেই সচকিত হয়।

দ্বিজু জানতে চায়, কি হলো জঙ্গলিদা?

- কিছু না। আয় তুই হাল ধর, আমি খানিক দাঁড় টেনে গা গরম করে নেই।

জঙ্গল দাঁড়ে এসে বসলো। একটা বিড়ি ধরিয়ে সবল হাতে দাঁড় টানতে আরম্ভ করলো।

একে জোয়ারের টান, তার ওপর জঙ্গলের বলিষ্ঠ হাতে দাঁড় টানা,

বাঘনার গাঙ পেরিয়ে রায়মঙ্গলের বুকের ওপর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চললো ডিঙি।

পারঘুমটি ঘাটের কাছে ছোট একটা খাড়ি। খাড়ির ভিতরে ডিঙি বেঁধে জঙ্গল চললো হিমে সা-র বাড়ি। দ্বিজু হাল আর দাঁড় খুলে কাঁধে নিয়ে বাড়ির দিকে চললো।

হিমে সার আড্ডা তখন গুলজার। পাঁড় মাতালগুলো ভিড় করেছে। একটা কিছু মুখরোচক আলোচনা চলছিল—কিন্তু উঠোন পেরিয়ে জঙ্গলকে আসতে দেখে সবাই চুপ করে গেল।

হিমে সা কে ডেকে জঙ্গল ভিতর দিকে গেল। নগদ তিনটে টাকা হিমের হাতে গুঁজে দিয়ে একটা বোতল নিলে জঙ্গল। বোতলের মুখটা মুখের মধ্যে পুরে পুরো বোতলটা শেষ করলো। তারপর খালি বোতলটা হিমে সা-র হাতে দিয়ে খিড়কির পথ দিয়ে যাবে বলে পা বাড়ালো। পিছু ডাকলো হিমে সা—শুনে যা।

জঙ্গল দাঁড়ালো।

হিমে চুপি স্বরে বললে, একটু সাবধানে চলাফেরা করিস—বাসুদেব কিন্তু তোরে খতম করার মতলব করছে।

জঙ্গল কথা না বলে তাচ্ছিল্যের সুরে একটু আওয়াজ করে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

অন্ত বাউলি আর সুমণি কথা বলছিল ঘরের দাওয়ায়। অন্ত তার জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতার কথা বলছিল, আর অবাক হয়ে শুনছিল, সুমণি।

জঙ্গলকে আসতে দেখে অন্ত বলে উঠলো, এই যে খুড়ি তোমার বীরপুত্তুর এয়েচে।

সুমণি উঠে ঘরের মধ্যে গেল।

যখনই দ্বিজু ফিরেছে, তখনই সুমণি বুঝেছে, তার ছেলে হিমে সা-র বাড়ি হয়ে আসবে। মাঝে কদিন বেশ ছিল ছেলেটা—আবার রোজ আরম্ভ করেছে সুমণি বলে বলে হয়রান হয়ে গেছে। নতুন করে আর বলতে চায় না। বলেই বা কি করবে। ওটা ওদের রক্তের দোষ।

জঙ্গল দাওয়ায় উঠে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। অন্তকে ডেকে বলে, কি গো বাউলি—এত সেজেগুজে বসে আছো কেন?

—সাজ দেখলি কোথায়? ক্ষারে কাচা কাপড় পরিছি, আর উড়ুনিটা গায়ে দিইছি। অন্ত বলে, বয়েস হয়েছে, একটু হাওয়া দিলেই শীত শীত করে। হ্যারে, কদিন তো বেশ ছিলি, আবার ওই সব গিলে এইছিস? এবারে ছেড়ে দে ও সব।

—তুমি গাঁজার কলকেটা ভেঙে ফেলতি পারো বাউলি? তা যদি পারো, কথা দিচ্ছি আমিও মালটানা ছেড়ে দেবো।

—এবারে তুই হাসালি জঙ্গল। আমি আর তুই—অন্ত মোলায়েম স্বরে বলে, আমি তো শেষ খেয়ায় যাবো বলে বসে আছি, আর তোর সামনে এখনো অনেক পথ। জঙ্গল, এবারে একটু নিজের দিকে ফিরে তাকা।

—বাউলি, এ আমার রক্তের দোষ। জঙ্গলের কণ্ঠস্বর এবারে কিছুটা জড়িত মনে হয়। বলে, ঈশ্বর পাহাড়ী তস্য পুত্র দুর্জয় পাহাড়ী, তস্য পুত্র জঙ্গল পাহাড়ী ঠাকুর্দা প্রাণ দেছে, বাপ প্রাণ দেছে, আর আমি আমার প্রাণ ছিনিয়ে আনবো বাউলি আজ তোমারে বলে দিচ্ছি, দেখো আমিও একদিন শান্ত হবো। বাউলি, তুমিই না একদিন বলেছিলে, বর্ষায় ঝড় বাদলে যে গাঙে তুফান ওঠে, শীতের দিনে সে গাঙ শান্ত হয়ে যায়। তোমার কথা আমি বুঝি বাউলি, ঝড়-বাদলের মরশুম একদিন শেষ হবে।

নেশাটা বেশ জমেছে জঙ্গলের। একটানা বকে চলেছে। নানারকম কথা। কথার যেন শেষ নেই। বাউলি একভাবে বসে শুনছে। কোনো কথা সে বলছে না। সে বেশ বুঝতে পারছে, জঙ্গলের মনে আবেগের বান ডেকেছে। এখন ও বানের তোড়ে ভেসে চলেছে।

কথা বলতে বলতে এক সময় শান্ত হয়ে যায় জঙ্গল। পাশেই চাটাই পাতা। মাথার নীচে দু হাত ভাঁজ করে দিয়ে এক সময় শুয়ে পড়ে জঙ্গল। যেমন শোয়া তেমন ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত জঙ্গলের মুখের দিকে ফিরে চায় অন্ত।

পোড় খাওয়া মানুষ অন্ত—জীবনে অনেক মানুষ দেখেছে, অনেক অভিজ্ঞতা তার। বুঝতে পারে, দুরন্ত মানুষটার মনে নতুন রঙ ধরেছে। তাই এতো আবেগের তোড়।

রাধার কথা মনে পড়ছে অন্ত'র। মেয়েটা বড় ভালো। হঠাৎ কখন জঙ্গলের মনে রঙ ধরিয়ে গেছে। আর এ রঙ ফিকে হবার নয়।

কিন্তু সে মেয়ে তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

অন্ত'র মনে হয়, সে চলে যাবে বৃন্দাবন। যদি সে মেয়ের দেখা সেখানে পাওয়া যায়।

মনের কথা মনেই থাকে। যা হবার নয়—তার জন্যে মিছে চিন্তা।

জঙ্গলের ঘুম ভাঙলো। চোখ দুটো তার জবা ফুলের মতো লাল। উঠে গাড়ু থেকে জল নিয়ে ঝাপটা দিলে চোখে।

অন্ত আর দ্বিজু বসেছিল দাওয়ার কোণে। সুমণি ঘরে বসে কুপীর আলোয় কাঁথা সেলাই করছিল।

ক্ষিধেয় পেটের নাড়ি চোঁ চোঁ করছে। জঙ্গল ডাক দেয় মাকে, মা—ভাত দেও।

—বসলেই দেই। আমি তো হাঁড়ি কোলে নিয়ে বসে আছি। সুমণি ডাক দেয় দ্বিজুকে। বলে—নে, জায়গা করে নে।

খেতে বসে অবাক হলো জঙ্গল। বড় বড় বান মাছের দাগা আর বাগদা চিংড়ি দেখে। বলে, এ মাছ কোথায় পেলে?

অন্ত বলে, দয়াপুরের দিকে বেড়াতে যাচ্ছিলাম—পথে সনাতন মালোর সঙ্গে দেখা—

- বুঝিচি। জঙ্গল বলে, তা মাঝে মাঝে তো বেরোলেই পারো।

-- মাঝে মাঝে নয় রে, অন্ত বলে, ভাবতিছি এবারে কিছু দিনের মতন বেরিয়ে যাবো। অনেক দিন তো হলো তোর এখেনে কাটানো। ভাঙা শরীর নে এই ছিলাম—কদিনে তবু একটু তাগোদ এয়েচে দেহে।

জঙ্গলের মনটা খারাপ হয়। বলে, নাই বা গেলে বাউলি, তুমি তো বলিছিলে, যে কটা দিন বাঁচবা এখানেই কাটাবা।

—তখন বলিছিলাম, কিন্তু এখন আর তা মন চাইছে না। দিন কতক ঘুরে আসি, আবার দেখবি একদিন তোর দরজায় এসে দাঁড়াইছি।

—যা ভালো বোঝো করে-জঙ্গল বলে, তবে এই ভাঙা শরীর নে কোথাও না গেলেই ভালো করতে। বেশ্ তো ছিলে এখানে।

—ছিলাম তো ভালোই। অন্ত বলে, জন্ম বাউণ্ডুলে কি এক জায়গায় বাঁধা থাকতি পারে? জানিস—মনটা আমার চঞ্চল হয়েছে। তাছাড়া আর কদিনই বা আছি—বছরের চাকাও ঘুরবে না, তারই মধ্যে খাঁচা ছেড়ে পাখি পালাবে। তাই ভাবি, শেষ বারের মতন ঘুরে নেই এক চক্কোর।

কথায় কথায় খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলো। এবারে শুয়ে পড়ার পালা। রাতও হয়েছে। জঙ্গল আর অন্ত দুজনেই বাইরের দাওয়ায় শোয়। বাইরে ঘুম আসে না, তাই দ্বিজু থাকে ছোট কামরাটায়।

শেষ রাতে কুকুরটা ভয়ংকর শব্দে ডেকে উঠলো। ঘুম ভেঙে গেল জঙ্গলের। দাওয়ার নীচে কুকুরটা তারস্বরে চীৎকার করছে।

জঙ্গল উঠে বসলো। পাঁচ ব্যাটারীর টর্চটা মাথার বালিশের নীচে থাকে। টর্চের আলোটা চারদিকে ঘোরালো। এবারে কুকুরটা সাহস পেয়ে তেড়ে গেল কলাঝাড়ের দিকটায়।

জঙ্গল নামলো উঠোনে। এগিয়ে গেল কলাঝাড়ের দিকে। টর্চটা আবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেললো। নাকে এলো সিগারেটের গন্ধ। নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল। একটা গরানের কোঁড়া ছিল হাতের কাছে, সেটা বাগিয়ে ধরে ভেড়ি পথ ধরে এগোতে লাগলো। একটা পথ দক্ষিণে বাগদীপাড়ার দিকে গেছে। বাঁক নিয়ে সেই পথে টর্চটা ফেলতেই দেখলো দুটো লোক হন হন করে ছুটছে।

ছুটতে আরম্ভ করলো জঙ্গল। লম্বা-লম্বা পা ফেলে এলো বাগদী পাড়ার মুখে। লোক দুটোও ছুটছে উর্দ্ধশ্বাসে। এবারে জঙ্গল হাঁকার দিলে, এ্যাই শালারা দাঁড়া, নয়তো বাপেব নাম ভুলিয়ে দেবো।

জঙ্গলের হাঁকারে আশপাশের কিছু লোকের ঘুম ভেঙে যায়। তারাও বেরিয়ে আসে। জঙ্গল সামনে টর্চ ফেলে সমানে ছুটছে, সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন।

আচমকা পিছনে হৈ হৈ শুনে থমকে দাঁড়ায় জঙ্গল। লাঠি সোঁটা নিয়ে এক দল লোক আসছে মারমুখো হয়ে। টর্চের আলোটা ঘোরাতেই মানুষগুলো দাঁড়ালো।

জীবন ঢালি এসেছে দলবল নিয়ে। হাতে হাতে লাঠি, সড়কি, বল্লম। কিন্তু টর্চের চোখ-ধাঁধানো আলো সরাসরি চোখে-মুখে পড়তেই মানুষগুলো থমকে দাঁড়িয়েছে।

জঙ্গল টর্চটা এই জ্বালাচ্ছে এই নেবাচ্ছে। মারমুখো মানুষগুলো কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এইমুহূর্তে। এগোতেও পারছে না, পিছোতেও পারছে না।

আচমকা পিছন থেকে আর্ত চীৎকার ওঠে, দলের সামনে যারা ছিল তারা কেমন হতচকিত হয়ে যায়। জঙ্গলও প্রথমটা কিছু বুঝে উঠতে পারে না। পিছন থেকে কে ওদের আক্রমণ করলে!

মওকা বুঝে জঙ্গল লাফিয়ে পড়লো জীবনের ওপর। জীবনের হাত থেকে সড়কি ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচ-ব্যাটারীর টর্চের আঘাত করলো তার মাথায়।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো জীবনের মাথায়। লুটিয়ে পড়লো ভেড়ির ওপর। জীবনের হাল দেখে দল ছত্রভঙ্গ। কিন্তু পালাবার পথ নেই। পিছনে ওসামান মিয়া দলবল নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

জঙ্গল ইতিমধ্যে পাঁচ সাত জনকে জখম করেছে। ক'জনকে পরনের কাপড়ের আঁচল কিংবা গামছা দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধেছে ওসমানের দল।

শেষরাতে হৈ চৈ চীৎকার শুনে পাড়ার লোকেরা যে যেমন পারে হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এসেছে। আলোও এসেছে হাতে হাতে।

ওসমানকে জড়িয়ে ধরলো জঙ্গল। —চাচা তুমি ?

জয়ের আনন্দ তখন ওসমানের মুখে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল জীবন ঢালির কাছে। কপালের ওপর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে জীবনের। ওসমান তার বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়ালো। বললে, কি রে—কেমন লাগতেছে ?

জীবনের কথা বলার শক্তি নেই। শুধু একবার জঙ্গলের মুখের দিকে ফিরে চায় !

জঙ্গল বলে, বকেয়া হিসেবের জের টানার আর ইচ্ছে আছে ? শয়তান কোথাকার। এবারে বল দিকিনি, ওদিকে পালালো কারা ?

হাপরটানার মতো নিঃশ্বাস নিয়ে জীবন বলে, বড় মোড়ল আর সুধন্য।

দাঁতে দাঁত ঘষে জঙ্গল বলে, এখনো মাদারগাছে গা ঘষার ঝোঁক।

ওসমান বলে, শূয়ায়ের বাচ্চার সঙ্গে কথা বলিস ক্যানে। চল ঘরে চল, শালারা থাক এখানে পড়ে। যত সব মশামাছির দল।

জঙ্গল থুতু ছিটিয়ে দেয় জীবনের মুখে, বলে, বেটা—থাক এখেনে পড়ে।

জীবন এবারে উঠে বসতে চেষ্টা করে, —এবারেও আমারে বাঁচায়ে রাখলে জঙ্গল ?

- তুই না বাঁচলি পাপ ভোগ করবে কেডা। যা বড় মোড়লের বাড়ি গে আইডিন লাগাবি। এবাঁরেও ছেড়ে দেলাম যা—

ওসমানের দলের সঙ্গে জঙ্গল বাড়ির পথ ধরে। পথে ওসমান শোনায় তার কথা। শেষ রাতে পায়খানায় যাবে বলে বাইরে বেরিয়েছিল ওসমান। বাইরে বেরিয়েই ও দেখতে পায় ঘাটের দিক থেকে একদল লোক এদিকেই আসছে। আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়ায় ওসমান। চাঁদের আলোয় জীবনকে সে স্পষ্ট চিনতে পারে। আর এই রাতে জীবনকে দলবল নিয়ে যেতে দেখেই বুঝতে পারে, ওরা সেদিনের ঘটনার বদলা নিতে চলেছে।

জীবনের দল চলে যেতেই ওসমান তার পাঁচছেলে আর নাতিদের ডাকে।

পাড়ার দু'পাঁচ জনকেও ডেকে নেয়। তারপর যা—তা তো জঙ্গল চোখেই দেখেছে।

বাড়ি ফিরেই জঙ্গল দেখলো তার মা মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদছে। আর তাকে বোঝাচ্ছে অন্ত বাউলি। —ভয় নেই জঙ্গলের গায়ে, কেউ কাঁটার আঁচড় দিতে পারে না।

—ভাবী। ওসমান বল্লম হাতে দাঁড়ায় সুমণির সামনে। বলে, কাঁদো কেনে—তোমার চোখে কি জল মানায়।

আঁচলে চোখ মোছে সুমণি। তারপর সকলের বসবার জন্যে দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে দেয়।

সকালে একটি খবর এলো জঙ্গলের কানে। বাসুদেব মোড়লের বউ তার শোবার ঘরের কড়িকাঠে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

॥ আট ॥

অন্ত বাউলি চলে গেছে। ভাঙা শরীর নিয়েও মানুষটা আবার বেপাত্তা হয়ে গেল। বলে গেছে মাঘের শেষে আবার আসবে। পারে তো আরো আগে চলে আসবে। চৈত্রে আবার মৌ-ভাঙার মরশুম। অন্ত বাউলি পারঘুমটির মউলেদের বাদায় নিয়ে যাবে। বলে গেছে, এই আমার শেষ মরশুম। আর বাঁচবো না। মনের জোরে যে কটা দিন থাকতি পারি থাকবো। এবারে বাদা থেকে ফিরে তোর হাতে ডোর বেঁধে দেবো জঙ্গল।

জঙ্গল সে কথায় কথা বলেনি। শুধু বলেছে, ঘুরে তো এসো। তারপর ওসব কথা হবে।

বাউলি চলে যাবার পর থেকে বাড়িটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে। জঙ্গলও আগের চেয়ে কিছুটা স্থির। নেহাৎ কাজ না পড়লে বাড়ির বাইরে যায় না। এটা-ওটা কাজকর্ম দ্বিজু একাই করে।

সুমণির দুশ্চিন্তা আরো বেড়েছে। পর পর যে সব ঘটনা ঘটছে, তারপর থেকে কেমন একটা ভয় চেপে বসেছে তার মনে। যে কথা কোনোদিন বলতো না সে, তাই বলে। এখানে জমিজমা যা আছে, বেচে কিনে অন্য কোথাও চলে যেতে চায় সে। যেখানে নোনা গাঙ নেই, যেখানে বাসুদেব মোড়ল আর জীবন ঢালির মতো শয়তানের বাস নেই।

কিন্তু জঙ্গল বলে, মা—কোথায় যাবা তুমি? গোটা দেশে মানুষের চেয়ে অমানুষের ভীড় বেশী। আমার জন্যে তুমি ভেবো না। তোমার জঙ্গল পাহাড়ীরে কব্জা করে এমন মানুষ জন্মায় নি। মা—আমি তো পাপ করিনি।

সুমণির ভয় তবুও যায় না। বার বার তার মনে হয়, তাদের বংশের ওপর অভিশাপ আছে। সে কথাটা অনেক সময় বলেও ফেলে সে।

আর অভিশাপের কথা শুনলেই জঙ্গল হাসে। বলে, মা—আমি সব অভিশাপের বোঝা ঝেড়ে ফেলবো। আমার জন্যি ভেবোনা তুমি।

তবু কি আর ভাবনা যায়। ভাবনাটা ঠিকই জড়িয়ে থাকে সুমণির মনে।

সেদিন বিকেল।

সুমণি বসে চাল থেকে ধান বাছছিল। জঙ্গল বাঙোড়ে জাল বেয়ে ফিরলো। মস্ত বড় দুটো বোয়াল মাছ, আর বেশ খানিক বাগদা চিংড়ি ধরেছে সে। জাল গাছটা উঠোনে বাঁশের আলনায় মেলে দিয়ে জঙ্গল বললে, দ্বিজু কোথায় মা বড় বোয়াল আর গোটাকতক বাগদা চিংড়ি ওসমান চাচার বাড়ি দে আসুক।

—না থাক, আমি নিজেই যাই।

বড় বোয়াল আর বেশ খানিকটা বাগদা চিংড়ি গামছায় বেঁধে ওসমান চাচার বাড়ি যাবে বলে বেরিয়ে গেল জঙ্গল।

ওসমান উঠোনে বসে গরুর দড়ি তৈরী করছিল। বোয়াল আর বাগদা চিংড়ি তার সামনে ঢালতে আনন্দে চীৎকার করে নাতি পুঁতিদের ডাক দিলে।

—দেখে যা তোদের জংলি কাকা কত মাছ আনিছে।

ওসমানের ঘরণী রোকেয়া গোবর মাখা হাতেই এলো। বললে, এ সময় তো এত বড়ো বোয়াল বড একটা দেখা যায় না।

—বাঙোড়ে পেলাম। এক খ্যাপোনেই এক জোড়া উঠলো। একটা রেখে একটা নে এ্যালাম।

—তা ভালোই হয়েছে। পেঁয়াজ-রসুন দে রান্না করি, দুটো খেয়ে যা।

—আজ থাক। বরং যেদিন মোরগ মারবা সেদিন খবর দিও। ভর পেট খেয়ে যাবো।

—তবে তাই হবে। রোকেয়া বলে, ছেলে খাবে মার কাছে—এ আবার বলাবলি কি। যেদিন খাতি ইচ্ছে হয় খাবা। মোরগ কিনতি তো বাজারে যাতি হবে না।

জঙ্গল বলে, যা বলেছো চাচী—এতো আমার ঘরবাড়ি। মা'র কাছে তো

শুনিচি, বাবা মরে গেল, কিন্তু চাচার জন্যি একটু আঁচ লাগলো না গায়ে। মা বলে, চাচা আমাদের 'পক্ষ আবডাল' করে রেখেছিল। নয়তো দুর্জয় পাহাড়ীর বিধবার চাল-চুলো তুলে দিতে এখানকার মানুষ কম চেষ্টা করেনি।

এক কথা থেকে অনেক কথা আসে। হাতের কাজ সেরে ওসমান এসে বসে দাওয়ায়। রোকেয়া তাল-ক্ষীর বানিয়েছে, আর সরুচাকলি—জঙ্গলের জন্যে থালায় করে তাই খানিক এনে দেয়। সরুচাকলি দিয়ে তাল ক্ষীর—চেটে পুটে খায় জঙ্গল। বলে, চাচা—পেট একেবারে ভরে গেল।

রোকেয়া বলে, তোমার পেট কি ওইটুকুতে ভরে। তোমার চাচার পেটটাও ধামার মতো সহজে ভরে না।

রোকেয়া ঘরে যায়। আরো কয়েকটা সরুচাকলি আর তাল ক্ষীর এনে দেয় জঙ্গলের পাতে। জঙ্গল 'না না' করে ওঠে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। রোকেয়া বলে, আরো খাবা তো দেবানে। খাও—অনেক করিচি।

তালক্ষীর মাখিয়ে সরুচাকলি আরাম করে চিবোতে লাগলো জঙ্গল।

রাতে গভীর ঘুমের মধ্যে সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখলো জঙ্গল। মায়ের কাছে তাদের বাপ-ঠাকুর্দার দেশ চিলকিগড়ের কথা শুনেছে সে। শুনেছে দেশটা নাকি সুন্দর। ছোট ছোট নদী, উঁচু নীচু জমি, শাল, পলাশ আর মহুয়ার অরণ্য, তারপর আশেপাশে ছোট বড় পাহাড়।

স্বপ্নে দেখেছে জঙ্গল, সে গেছে চিলকিগড়ে। অচেনা মানুষ সে, একে ওকে জিজ্ঞাসা করে পৌঁছেচে চিলকিগড়ে। সেদিন কিসের যেন উৎসব ছিল সেখানে। গাঁয়ের মানুষ—ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই মিলেছে এক জায়গায়। জঙ্গল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই একদল লোক তাকে ঘিরে ধরলো। সবাই দেখছে দশাসই চেহারার মরদ জঙ্গলকে। এমন মানুষ তারা যেন দেখেনি।

তুমি কে ?

একজন বৃদ্ধ জানতে চায়।

বৃদ্ধ মানুষটি জঙ্গলকে খুঁটিয়ে দেখছিল। লোকটি অনেক সময় ধরে খুটিয়ে দেখে আপন মনে বলে, তোর মুখে দেখি ঈশ্বর পাহাড়ীর মুখের আদল।

ঈশ্বর পাহাড়ী! সেতো আমার ঠাকুর্দা।

তুই ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি—দুর্জয়ের বেটা—

এর পরেই ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠলো। জঙ্গলকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে চললো একটা চাঁদোয়ার নীচে। আর সেই মুহূর্তেই

ঘুম ভেঙে গেল জঙ্গলের। জঙ্গল ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। চাপা চীৎকার করে বললে, আমি ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি, দুর্জয় পাহাড়ীর বেটা জঙ্গল পাহাড়ী।

সেই রাতেই মাকে ডেকে তুললো জঙ্গল। মনের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা তার। সুমণিও ভয় পেয়ে গেছে ছেলের রকমসকম দেখে। জঙ্গলের মুখে এক কথা, আমি চিলকিগড়ে যাবো। বলো মা, কি করে যাতি হয়।

-- তুই অমন সব্যনেশে কথা বলিস নে!

—মা, আপত্তি কোরো না। আমি সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখিছি। শোনবা?

স্বপ্নের কথা বলে যায় জঙ্গল। সুমণি অবাক হয়ে শোনে। বলে, আমি জানি, তোরে আমি আঁচলে বেঁধে রাখতি পারবো না।

—মা, জঙ্গল কখনো মিথ্যে কথা বলে না। তোমারে কথা দেলাম, আমি আবার তোমার কাছেই ফিরে আসবো।

সুমণি বলে, কিন্তু সামনে দুগ্যাপূজো, পূজোর কটা দিন যাক, তারপর যাতি হয় যাস।

তখনকার মতো শান্ত হয় জঙ্গল। আর কদিন বাদেই পূজো, এ কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

মনের ইচ্ছের কথাটা ওসমান চাচারে জানালো। জঙ্গলের আগ্রহ দেখে ওসমান আর 'না' বলে পারলো না। কিন্তু মনের দিক থেকে জঙ্গলের এ যাওয়ায় তার আপত্তি। জঙ্গলের চরিত্র তো তার অজানা নয়। যাচ্ছে অচেনা অজানা জায়গায়, সেখানে একটা কিছু অঘটন না ঘটিয়ে বসে।

জঙ্গলকে বুঝিয়েসুজিয়ে ওসমান বলে, না গে যখন ক্ষান্ত হবি নে, তবে যা, বাপঠাকুর্দার ভিটেটা দেখে আয়। কিন্তু থাকবি কোথায়? কাউকে তো চিনিস নে জানিস নে।

জঙ্গল বলে, মার কাছে শুনিচি আমার ঠাকুর্দার নাকি ছোট একটা ভাই ছিল। তার নাম ভীম পাহাড়ী। ভীম পাহাড়ীর বড় ছেলে নাকি বাবার চেয়ে বয়সে দু বছরের ছোট। একবার নাকি এইছিল এখানে। তার নাম মার কাছে জেনে নিইছি—হিন্দোল পাহাড়ী। আমি তো আর পরের ঘরে যাচ্ছি নে—কাকার কাছে গে ওঠবো। দুচারটে দিন ছাড়া তো সেখানে ঘর বাঁধতে যাচ্ছি নে। মন টেনেছে, নয়তো ওরকম একটা আন্‌কা স্বপ্ন দেখবো কেন!

—ভাবীরে নে যা না।

—মা গেলে চলবে কি করে। ঘরদোর, গরু বাছুর রয়েছে এসব তো দেখতি হবে, তারপর মা যাতিও চায় না। জঙ্গল বলে, তুমি তো সবই জানো চাচা—মার মনে সব সময় ভয়—সেই অভিশাপ নাকি আমাদের ওপর এখনো রয়েছে। তোমারে আমি বলে দিচ্ছি—অভিশাপের কথাটা যে মিথ্যে, সেটা আমি দেখায়ে দেব।

ওসমানের মুখে কোন কথা নেই। জঙ্গলের বাবা দুর্জয়ও এমনি করে বলতো। সে-ও তার শক্ত বুকে চাপড় মেরে বলতো, আমি দুর্জয় পাহাড়ী, ঈশ্বর পাহাড়ীর বেটা—আমারে যম অব্দি ভয় করে। কেডা কি করবে আমার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বাঘের থাবায় মরলো।

সেদিনের ভয়ংকর দৃশ্যটা এখনো ওসমানের চোখের সামনে স্পষ্ট। রক্ত মাখা খানিকটা দলা দলা মাংস আর হাড়গোড়, মাথার ওপর দিকটাও ছিল. না—সেই তাল গোল পাকানো রক্ত মাখা মাংসের দলা আর হাড়গোড় নিজের হাতে ঝুড়ি করে কুড়িয়ে এনেছিল ওসমান। সেই ভয়ংকর দৃশ্যের কথা মনে করলে এখনো শিউরে উঠতে হয়। অথচ ওই দুর্জয় গাদা বন্দুক, আর বল্লম দিয়ে বাঘ মেরেছে। একা রুখে দাঁড়িয়েছে বাঘের মুখোমুখি।

একবারের ঘটনা। সমশেরনগরে বাঘের উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। বেশ কয়েকটা গরু ছাগল তো গেছেই, তিন জন মানুষকেও মেরেছে। ভয়ে কেউ ঘরের বার হয় না। ফরেষ্ট অফিসের বাবুরাও চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাঘটার হদিশ করতে পারেনি। অথচ সাতদিনের মধ্যে গরু ছাগল আট দশটা, সেই সঙ্গে তিনটে মানুষকেও খতম করেছে।

খবরটা কানে এলো দুর্জয়ের। কোনো কথা নয়, শুনেই গাদা বন্দুক আর দশ হাত বল্লমটা নিয়ে এলো ওসমানের কাছে। ওসমানভাইরে বাদ দিয়ে দুর্জয় কোথাও যেতো না। আর ওসমানের চোখে দুর্জয় ছিল বড় ভাই-এর মতো। বড় ভাই একবার এসে ডাক দিলেই ওসমান সাড়া না দিয়ে পারতো না।

দুর্জয় আর ওসমান চললো সমশেরনগরে। ওসমানের হাতে বর্শা আর দুর্জয়ের গাদা বন্দুক আর বল্লম তো আছেই।

তিন দিন, তিন রাত—গাদা বন্দুক দিয়ে ভয়ংকর মানুষখেকোটাকে ঘায়েল করেছিল দুর্জয়।

পুরনো কথা ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ওসমান!

যেদিন যম সামনে এসে দাঁড়ালো, সেদিন কিছুই করতে পারেনি দুর্জয়।

—ভাবো কি, অ চাচা ?

ওসমান ফিরে চায় জঙ্গলের দিকে। চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, তোর বাপের কথা ভাবতেছিলাম।

ওসমানের নাতনি জোবেদা এসে দাঁড়ায় দুটি সানকি হাতে। গরম গরম তালের বড়ার গন্ধে জায়গাটা মৌ মৌ করে ওঠে।

একটা থালা ওসমানের আর একটা জঙ্গলের। সানকি হাতে নিয়ে জঙ্গল চীৎকার করে চাচীকে ডাকে, বলে, আরো ভাজো চাচী—এটা আমার নস্যি।

ভিতর থেকে জবাব আসে, তুমি খাও না কতো খাবা। কড়া চাপানো আছে চুলোয়।

জঙ্গলও গলা চড়িয়ে বলে, ঠিক আছে, এই আমি খাতি আরম্ভ করলাম।

গরম গরম তালের বড়ার সঙ্গে চলছে নানারকম গালগল্প।

একথা ওকথার মধ্যে ওসমান বলে, জঙ্গল—এবারে সংসার কর—আর না করিস নে। ভাবীর মনেও শান্তি আসবে, আর তোর মনটাও স্থির হবে।

তালের বড়া মুখে পুরে হেসে ওঠে জঙ্গল। বলে, সংসার আমার জন্যি না। এইতো বেশ আছি।

।। নয় ।।

যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ। এখন রাত শেষে গোবিন্দকাটি থেকে প্রথম লঞ্চে কালীনগর যাবে জঙ্গল। তারপর সেখান থেকে বাস ধরে বসিরহাট। ওখান থেকে কলকতা। গোবিন্দকাটির পঞ্চানন মণ্ডলের বড় ছেলে সমর রেলে চাকরি করে। তার কাছেই জেনেছে, রাত সাড়ে আটটায় হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়বে। সমর কথা দিয়েছে, স্টেশনের মধ্যে বড় ঘড়ির নীচে অপেক্ষা করবে সে। তারপর সেই টিকিট কেটে গাড়ীতে তুলে দেবে।

যাবে বলে কদিন আগে থেকে তৈরী হচ্ছে জঙ্গল। জামা-কাপড় ধোপা বাড়ি থেকে কাচিয়ে রেখেছে। নতুন একটা সাটিন-এর পাঞ্জাবী করিয়েছে। জুতোটায় ছাতা পড়েছিল, শ্রীধরকাটির হাটখোলার মুচির কাছ থেকে পালিশ করিয়ে নিয়েছে। জুতোয় এখন আরশির মতো ঝিলিক দিচ্ছে। জামা-কাপড় গামছাটামছা গুছিয়ে নিয়েছে ওসমানের ছেলে মানিকের ফুল আঁকা টিনের সুটকেশে। ছোট ঠাকুর্দা হয়তো নেই—কিন্তু বাড়ির লোকজন তো

আছে। তাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক। কিছু না নিলে ভালো দেখায় না। এক কেঁড়ে বাদার মধু নিয়েছে, আর হাজু ময়রার কাছ থেকে কাঠিগজা মেঠাই বানিয়ে নিয়েছে বেশ খানিকটা। আর ঠিক করেছে, বসিরহাট থেকে খানিকটা কাঁচাগোল্লা কিনে নেবে।

এতদিন আনন্দ ছিল মনে। কিন্তু আজ সন্ধ্যের পর থেকে আনন্দে ভাঁটা পড়েছে। কিছুটা ভাবনা পেয়ে বসেছে। যেখানে যাচ্ছে, সেখানে সবাই তো অচেনা। তাকে কে কি-ভাবে নেবে কে জানে। যদি তাকে আমল না দেয়, যদি ছোট ঠাকুর্দার বাড়ি কেউ না থাকে—তাছাড়া যদি তাকে ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বলে বিশ্বাস না করে।

যাবে বলে পা বাড়িয়েও জঙ্গল ভাবে, না গেলেই ভালো হতো।

কিন্তু সুমণি আজ হঠাৎ যেন বদলে গেছে। ছেলের যা কিছু সে-ই গুছিয়ে দিয়েছে। তারপর বলছে, যা - গেলে দেখবি, তোরে পেয়ে তারা মাথায় করে নাচবে। তোর ঠাকুর্দা ছিল সে তল্লাটে মানুষের মতো মানুষ। তার এক ডাকে নাকি হাজার মানুষ এক সঙ্গে বেরিয়ে আসতো। সেবারে হিন্দোল আইছিল— তখন তুই ছেলে মানুষ—কতো করে বলে গিছিল আমারে যাবার জন্য। কিন্তু আমি যাবো না—তুই যখন যাচ্ছিস, তখন তাদেরও আসতি বলবি। হাজার হোক আপনজনতো—নাড়ির সম্পর্ক।

মা, গাদা বন্দুকটা নেবো?

- না, না—ওসব নিবি কি করতি? তুই তো শিকার করতে যাচ্ছিস নে। তুই যাচ্ছিস বাপ পিতাম'র ভিটেয়—মনে আনন্দ নে যাবি আসবি।

সুমণি আরো বলে দিয়েছে, বড়দের যেন 'পেরনাম' করে জঙ্গল, ছোটদের আদর করে। তারপর দেশের পাঁচজন গণ্যমান্যদের সঙ্গে যেন দেখা করে। চিলকিগড়ের রাজবাড়িতে তার ঠাকুর্দার ছবি আছে, সে ছবিতে যেন মাথা ঠেকিয়ে আসে।

আরো বলেছে সুমণি, শাল মহুয়ার জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট নদীর ধারে নাকি 'কনকতুগ্যা'র মন্দির আছে, যে 'পিরতিমে' জাগ্রত - সেখানে যেন জঙ্গল পাঁচ সিকে পূজো দিয়ে আসে মায়ের নামে। এখানে বসেই ঠাকুরকে মনের কথা শোনাবে সুমণি। কিন্তু মনের কথাটা কি, সুমণি তা বলেনি। বললে, জঙ্গল এখনই মাথা গরম করবে।

মা ছেলেতে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত কথা হলো। তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

শেষরাতে কাকপক্ষী ডাকার আগে ঘুম ভাঙলো জঙ্গলের। তৈরী হয়ে নিল। জিনিসপত্তর দ্বিজু হাতে তুলে নিলে। শুধু ফুল আঁকা সুটকেশটা জঙ্গলের হাতে।

পরিপাটি করে সাজগোজ করেছে জঙ্গল। পরনে ধোপাবাড়ির কাচা কাপড় মালকোঁচা দিয়ে পরা, পায়ে পালিশ করা বুটজুতো। জুতোর ফিতেটাও কায়দা করে বেঁধেছে সে। গায়ে দিয়েছে চকচকে 'সাটিন' এর জামা। গলার বোতামটা দিতে ভোলেনি। মাথার বাবরি চুলে তেল জল দিয়ে আঁচড়ে নিয়েছে। গোঁফের ডগাটা ছুঁচলো করে দুদিকে তোলা। ওদের বংশের নিয়ম কানে মাকড়ি পরা। কান বিঁধনো আছে জঙ্গলের, বড় হবার পর থেকে মাকড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছিল। সুমণি প্যাঁটরা থেকে দুটি সোনার মাকড়ি বার করে নিজের হাতে পরিয়ে দিলে ছেলের কানে। বললে, এটা তোদের বংশের চিহ্ন। যেখানে যাচ্ছিস, সে দেখবি সবার কানেই সোনার মাকড়ি। যে ভিগ্ মেগে খায়, সে-ও যেমন তেমন দুটো মাকড়ি পরে।

আর সময় নেই। লঞ্চ আসার সময় হলো। লঞ্চঘাটায় যেতে খানিক সময় যাবে। মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে জঙ্গল চললো। বলে গেল, মা যেন না ভাবে। গিয়েই চিঠি লিখবে। আর ওসমান চাচারে বলা আছে, সুবিধে অসুবিধের কথা মা যেন জানায় তাকে।

হাসি মুখে উঠোন পর্যন্ত ছেলেকে এগিয়ে দিলে সুমণি। বীর পুরুষের মতো চলে গেল জঙ্গল। আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়।

জঙ্গল যাবার পরেও খানিক সময় উঠানের একান্তে দাড়িয়ে থাকে সুমণি।

রাত তখন আড়াইটে। গিধনী স্টেশনে নামলো জঙ্গল। আরো জনকয়েক যাত্রী নেমেছে। কেউ যাবে বেলপাহাড়ী, কেউ পরিহাটি, কেউ-বা চিলকিগড়. কিংবা অন্য জায়গায়।

স্থানীয় দু'পাঁচজন যাত্রী, তারা এই রাতেই চলে গেল। কিন্তু দূরের যারা তারা রইলো প্লাটফর্মে।

জঙ্গল প্লাটফর্মে নেমে চারদিকে তাকালো। রাতে কিছুই বোঝার উপায় নেই। প্ল্যাটফর্মে টিকিট ঘরের সামনে বেঞ্চিতে বসে বিড়ি ধরাল জঙ্গল। এত রাতেও স্টেশনে চা পাওয়া যায়—চা খেলে একটু মন্দ হতো না। এক পেয়ালা চা নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে পান করলো সে।

প্ল্যাটফর্মে যাদের রাত কাটাতে হবে, তারা যে যার মতো হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু জঙ্গল বসে রইলো ঠায়। পূবের আকাশ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত যাবার উপায় নেই। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রায় মাইল চারেক পথ হবে চিলকিগড়। পথে নানারকম বিপদ। দুষ্ট মানুষেরা তো আছেই, তারপর রয়েছে জন্তু জানোয়ারের ভয়। যদিও ভয় কি তা জানে না জঙ্গল, তবু অচেনা অজানা জায়গায় হিসেব করে চলাই ভালো।

খানিকসময় বসে রইলো জঙ্গল। তারপর ঘুম জড়িয়ে এলো চোখে। স্যুটকেশটা মাথায় দিয়ে বেঞ্চির ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো জঙ্গল। যেমন শোয়া, তেমনি ঘুম—ঘুম ভাঙলো যখন, তখন দিনের আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটেছে।

উঠে বসলো জঙ্গল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। জঙ্গল প্ল্যাটফর্মের কল থেকে চোখে মুখে জলের ছিটে দিলে। তারপর জিনিষপত্তর গোছগাছ করে ষ্টেশনের বাইরে এলো।

স্টেশনের বাইরে কয়েকজন মানুষ, তাদের কাছে চিলকিগড়ের পথ জানতে চাইলো জঙ্গল। সিধে রাস্তা দেখিয়ে দিলে।

লাল কাঁকরের রাস্তা। সোজা চলে গেছে। জঙ্গল দ্রুত পা চালালো সেই পথ ধরে। পথের ধারে কিছু বাড়ি ঘর, পথেও কিছু লোকজন চলাফেরা করছে। অনেকেরই চোখ এসে পড়ছে দশাসই চেহারার জোয়ান জঙ্গলের দিকে। এমন চেহারা বড় একটা চোখে পড়ে না। তাই যে দেখছে, সেই অবাক হচ্ছে।

জঙ্গলের কারো দিকে চাইবার অবকাশ নেই। সে একমনে হেঁটে চলেছে। তার একটাই চিন্তা, কতক্ষণে পৌঁছবে চিলকিগড়। কতক্ষণে বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের ধুলো গায়ে মাখবে।

বসতি এলাকা শেষ হলো। লাল কাঁকরের সড়ক চলে গেছে সমান্তরাল রেখার মতো। পথের দুধারে সুন্দর অরণ্য। শাল, মহুয়া, পিয়াশাল—আরো কতো রকমের গাছপালা। বনের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলধারা বয়ে আসছে। জঙ্গলের চোখে এদেশের সব কিছু নতুন। সুন্দরবনের মাটি, জল, বাদাবন—তার সঙ্গে এখানকার কোথাও কোনো মিল নেই। এখানকার বাড়ি-ঘর, মানুষজন, পথ-ঘাট সবকিছুর চেহারাই আলাদা। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, নতুন দৃশ্যপট জঙ্গলের চোখে কেমন যেন নেশা ধরায়। বিশেষ করে চোখের সামনে ঢেউ খেলানো লাল কাঁকরের সড়ক তার চোখে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

—কুথা যাবেক কর্তা ? দুজন পথচারী আসছিল। জিজ্ঞাসা করে অচেনা মানুষ দেখে।

জঙ্গল জবাব দেয়, চিলকিগড়।

—কার বাড়ি বটে গ ?

—পাহাড়ীদের বাড়ি।

—কোন পাহাড়ী ?

—ভীম পাহাড়ীর বেটা হিন্দোল পাহাড়ী।

—অ।

লোক দুজন চলে যাচ্ছিল। জঙ্গল শুধোয়, চিলকিগড় আর কতদূর ?

—আর তো আস্যে গেছে। সামনে রাজবাড়ি পড়বে, ওই তো চিলকিগড়। পাহাড়ীদের ঘর যাবেক তো ডুলুং পেরিয়ে যেতে হবেক। তুমার ঘর কুথায় ?

—সুন্দরবন।

লোক দুজন থমকে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করে জঙ্গল পাহাড়ীর আপাদ-মস্তক। তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, সুন্দরবনের বাঘের কথা শুনিচি বটে, কিন্তু মানুষের কথা শুনি নাই। হ্যাঁ—তুমি মানুষ বটে গা। হিন্দোল পাহাড়ীর বাপকে দেখিচি—আর দেখলাম তুমাকে।

লোক দুটি চলে গেল। জঙ্গলও তাড়াতাড়ি পথ হাঁটতে লাগলো।

রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো জঙ্গল। বিরাট বাড়ি। সদর দেউড়িতে বর্শা হাতে একজন লোক দাঁড়িয়ে। একবার রাজবাড়ির দিকে তাকিয়ে আবার পথ চলতে লাগলো জঙ্গল।

দুদিকে চলে গেছে পথ। কোন পথে যাবে ভাবতে লাগলো। ক'জন লোক আসছে। তাদের কাছে জেনে নেবার জন্য দাঁড়ালো জঙ্গল।

বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। সামনেই পড়বে ছোট্ট নদী ডুলুং। নদী পেরিয়ে যেতে হবে ওপারে। তারপর জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর এগুলে পাহাড়ীদের পাড়া। হিন্দোল পাহাড়ীর বাড়ি বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে।

নদী-জলের দেশের লোক জঙ্গল। ডুলুং দেখে মনে মনে হাসলো।

ছোট্ট নদী! কিন্তু কাছে নেমে দেখলো জলের তোড় বটে।

ক'জন মানুষ পায়ে হেঁটে নদী পার হচ্ছে। দেখাদেখি জুতো খুললো জঙ্গল। কাপড় হাঁটুর ওপরে তুলে নিলে। মালপত্তর মাথায় নিয়ে জলে নামলো।

জলের টানে পা রাখা দায়। সাবধানে ছোট্ট নদী পেরিয়ে এসে আবার জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে নিলে।

এবারে আর লাল কাঁকরের চওড়া পথ নয়—সরু পথরেখা বনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। তারপর পথও উঁচুনীচু।

কিছু পথ হেঁটে এলো জঙ্গল। দুটি পথরেখা এদিক ওদিক চলে গেছে। কোন পথ পাহাড়ীদের পাড়ায় গেছে কে জানে।

ক'জন আগেভাগে নদী পেরিয়ে এলো। তারা বনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। নতুন কাউকে না দেখা পর্যন্ত কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারলো না জঙ্গল।

আচমকা হাসির শব্দে সচকিত হয় জঙ্গল। মেয়েলিকণ্ঠের হাসি। ফিরে তাকালো সে। দেখলো বন ভেঙে দুটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে। এক জনের হাতে এক ঝুড়ি আতা, আর একজনের মাথায় শুকনো কাঠকুটোর বোঝা। আর দু'জনেরই হাতে খানিকটা করে বনের ফুল।

জঙ্গলকে দেখেই মেয়ে দুটি ডাগর চোখে একবার তাকিয়েই চুপ করে গেল। কিন্তু হাসির রঙ ফুটে রইলো তাদের মুখের রেখায়। একটি কালো মেয়ে তো জিব কেটেই ফেললো।

মেয়ে দুটির পরনে লালরঙের পাছাপাড় শাড়ী। আদুল গা। শাড়ীর আঁচলটা বুকের উপর দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া। হাতে রূপোর বালা। নাকে নাক চাবি। কানে কাল পাথরের দুল। পরনের শাড়ী হাঁটু অব্দি তোলা।

জঙ্গল জানতে চায় হিন্দোল পাহাড়ীর বাড়ি কোন পথে। যে মেয়েটির মাথায় আতার ঝুড়ি, সেই পথের নিশানা বলে দেয়। ডান দিকে যে সরু রাস্তা চলে গেছে, সেই রাস্তাই পৌঁছে দেবে হিন্দোল পাহাড়ীর বাড়ির উঠোনে। পাহাড়ীদের পাড়ার মুখেই হিন্দোল পাহাড়ীর বাড়ি।

জঙ্গল ডান দিকের সরু রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করে। আর এক-একবার পিছন দিকে ফিরে চায়, সেই মেয়ে দুটি এই পথেই আসছে কি না।

নিবিড় ছায়া-জড়ানো পথ দিয়ে জঙ্গল এসে পৌঁছয় হিন্দোল পাহাড়ীর বাড়ির উঠোনে। একটা ভয়ংকর কালোরঙের কুকুর চীৎকার করে তেড়ে আসে। বাড়ির উঠোনে ঝুড়ি বুনছিল একজন মাঝ-বয়সী পুরুষ, খামোকা কুকুরে চীৎকারে ফিরে তাকায়। সামনেই পথের ধারে উঠোনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দশাসই চেহারার মরদ জঙ্গল পাহাড়ী। কুকুরটা চীৎকার করে ছুটে গিয়ে জঙ্গলের গা শুঁকতে লাগলো।

—এই হিন্দোল পাহাড়ীর-বাড়ি ?

—আমিই হিন্দোল বটে। হিন্দোল হাতের কাজ ফেলে উঠে আসে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জঙ্গলকে। ভ্রূ কুঁচকে ওঠে তার। জিজ্ঞাসা করে, তুই কে বটে গ ?

—আমি জঙ্গল পাহাড়ী।

—জঙ্গল পাহাড়ী! হিন্দোলের চোখে-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। তারপরই চীৎকার করে ওঠে, চিনছিরে, তোরে আমি চিনতে পেরেছি র‍্যা— তুই ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি, দুর্জয় পাহাড়ীর বেটা—

বলে জঙ্গলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হিন্দোল। চীৎকার করে ডাকে, ওরে পিংলা, ওরে চন্দরা—তোরা আয়রে, তোদের মারে ডাক দে, দেইখ্যে যা কে এইছে। আরে, তরে আমি দেইখ্যেই চিনছি · অমন চেহারা, ঝাঁকড়া চুল, তারপর অমন চোখ –তরে আমি দেইখ্যেই চিনছি –আয় আয়—

জিনিসপত্তর নামিয়ে রেখে হিন্দোলের পায়ের ধুলো নেয় জঙ্গল। বলে, তুমি তো আমার কাকা।

—হাঁ রে হাঁ, আমি তর বাপের ভাই বটে গ –ভীম পাহাড়ীর বেটা। হিন্দোল আবার চীৎকার করে ডাক দেয়, ত পিংলা, অ চন্দরা—ইধারে আয়—তোদের মা'কে ডাক।

—চেল্লাও ক্যানে, কি হইছে। বাইরে বেরিয়েই নতুন মানুষকে দেখে চুপ করে যায় পিংলার মা।

হিন্দোল চীৎকার করে বলে, ইধারে এসো গ—দেইখ্যে যাও।

জঙ্গল আসতে আসতে এগিয়ে যায়। পিংলার মায়ের পায়ের ধুলো নেয়। বলে, আমি জঙ্গল—

হিন্দোল বলে, দেইখছো না—ও ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি—দুর্জয় পাহাড়ীর বেটা—আমার ভাইপো।

পিংলার মা অবাক চোখে দেখে জঙ্গলের মুখের দিকে। সে তার শ্বশুরকে দেখেছে—সে মানুষও এমনি দশাসই চেহারার ছিল। আর ঠিক যেন সেই চেহারা—সেই চোখ, সেই মুখ, মাথায় সেই বাবরি চুল—

—তু দাঁইড়ে আছিস কেনে? আয়, বস।

জঙ্গলের দু চোখে জল নামে। সে বারবার ফিরে চায় হিন্দোলের মুখের দিকে।

—কান্দিস কেনে! পিংলার মা বলে, ঘরের ছেইল্যা ঘরে এইছিস—কান্দতে নাইরে।

—পিংলা কুথায় গেছে, ইচন্দরারে দেইখি না কেনে? বলে পিংলার নাম ধরে চীৎকার করে ডাকে হিন্দোল।

বনবাদাড় ভেঙে পিংলা এসে পৌঁছয়। মাথার শুকনো কাঠের বোঝা। দূর থেকে শুনতে পেয়েছে বাবার ডাক। দূর থেকেই সাড়া দেয়,—যাই বাবা।

পিংলা কাঠের বোঝা নামিয়ে রাখে। আর মেয়েটি আতার ঝুড়ি একান্তে রেখে দেয়। এদের সঙ্গেই বনের পথে দেখা হয়েছিল জঙ্গলের, এরাই পথের হদিশ দিয়েছিল তাকে।

—দাঁড়িয়ে আছিস কেনে! হিন্দোল বলে, তোর বড় ভাই।

পিংলা অবাক হয় বাবার কথা শুনে।

হিন্দোল বলে, আরে ও ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি, বুঝলি?

পিংলা এবারে বলে, তাই বটে। বড় ঠাকুদ্দার কথা তো ইখানকার বনের গাছপালাও জানে। আর দাদাকে তো পথের কথা কাজলি বলে দিইছে।

কাজলি একান্তে দাঁড়িয়ে দেখছে নতুন মানুষ জঙ্গল পাহাড়ীকে। দেখার মতোই বটে। আর জঙ্গলের চোখও একসময় কাজলির ওপর পড়ে। কাজলি মাথা নীচু করে।

হিন্দোল বলে, আরে কাজলি, তর বাপকে খবর দিগে। বলগ্যা—ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি আইছ্যা। যা—ছুট্যা যা।

আতার ঝাঁপি পড়ে থাকে। কাজলি ছুটে চলে যায়। পাহাড়ীদের পাড়ার ছেলেমেয়ে বুড়ো সবাই জানে ঈশ্বর পাহাড়ীর কথা। যার গায়ে ছিল অসুরের শক্তি, মনে ছিল আগুনের মতো তেজ, যার চোখের দিকে তাকাতে বনের বাঘও মাথা নীচু করতো, নেকড়েকে যে আছাড় দিয়ে মারতো। একটা আস্ত শূয়োর যে পুড়িয়ে খেতো। তারপর আরো কতো কথা ছড়িয়ে আছে ঈশ্বর পাহাড়ীর নামে।

তুলুং নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল চন্দরা। ফিরে এলো ছোট ছোট পাবদা আর বাটা মাছ নিয়ে। এসেই জঙ্গলকে দেখলো। শুনলো তার কথা, শুনে শুধু একটা কথাই বললে, তুমারে আমরা আর ছাড়বো না জঙ্গলদা, ইখানে থাকত্যা হবেক। তুমার মা—আমাদের জেঠিকে আমরা নিয়ে আসবো।

জঙ্গল বলে, এখন তো আছি। যাবার সময় তোমারে নিয়ে যাবো আমি। সুন্দরবনটা একবার দেখে আসবা।

—চিলকিগড়ের বনের মতন সোন্দর বন কুথাও নাইরে—এ বন মানুষ রে পাগল কইরে দেয়।

দেখতে দেখতে রীতিমত ভিড় জমে গেল। পাহাড়ী পাড়ার অনেকেই ছুটে এসেছে ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতিকে দেখতে। কাজলি এসেছে তার বাবা গগন পাহাড়ীকে নিয়ে। এসেছে হারু পাহাড়ী, মাতন, সুরিন্দর, লোচন—মাতব্বর গোছের আরো লোকজন এসেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো ভিড় করেই ফেলেছে।

জঙ্গল বসেছে দড়ির খাটিয়ায়। পাশে হিন্দোল। জঙ্গলের বুক ভরে উঠেছে। তার মনে আনন্দের বান। সে শুধু দেখছে। কালো কালো চেহারার একদল মানুষ—ছেলেমেয়ে, জোয়ান, বুড়ো—সবারই চোখ তার দিকে। সবাই বলছে, হ্যাঁ, এ ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতিই বটে। যারা ঈশ্বর পাহাড়ীকে চোখে দেখেছে, তারা তো এক বাক্যে বলছে, এ ঈশ্বর পাহাড়ী ফিরা৷ আইছ্যা।

পিংলা একটা বাটিতে খানিকটা ছোলা-গুড়ের মণ্ডা আর এক ঘটি জল নিয়ে জঙ্গলের সামনে রাখলো। —রাত জেগ্যে এইছো, খেয়্যে নাও।

জঙ্গল ফিরে চায়, হিন্দোলের মুখের দিকে।

হিন্দোল বলে, খেয়্যে নে—

ঘটির জলে কুলকুচো করে মণ্ডা মুখে দেয় জঙ্গল। খানিক বাদে পিংলা আসে একবাটি চা নিয়ে। এত মানুষের সামনে বসে খাওয়া, জঙ্গল মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করে। এগিয়ে আসে কাজলির বাবা গগন, বলে, আরে, খেইয়্যে নে বেটা—আমরা তো রাত জেগ্যে আসি নাই—সরম করিস না—খা।

ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্য করলো জঙ্গল, একান্তে কাজলির কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে পিংলা হাসছে।

কালো মেয়ে কাজলির খোঁপায় একরাশ বনের ফুল।

গগন বলে, হিন্দোল—একটা কথা, আজ রাইতে উ কিন্তু আমার ঘরে খাবেক।

হিন্দোল বলে, আজ কেনে?

—হ্যাঁ, আজই। পিংলা, চন্দরা—উরাও খাবেক।

—আর আমরা বুড়া-বুড়ি বুঝি তর ঘরের পথ চিনি না?

হাসির রোল ওঠে হিন্দোলের কথায়। গগন বলে, তা তুমরাও যাবে।

হিন্দোল বলে, আরে না না, বুড়া-বুড়িরা আজ যাবেক নাই—জঙ্গল যাবেক, চন্দরা যাবেক, পিংলা যাবেক—

—কুন কথা শুনবো নাই। তুমরাও যাবে—নয়তো আমার মনে খারাপ লাগবে –বলে গগন চেপে ধরে হিন্দোলের দুটি হাত।

—আরে যাবো যাবো। খাসি মারবি, না মোরগ মারবি?

—গরীবের ঘরকে যা জুটবে তাই খেতে হবেক—গগন বলে, সন্ধ্যের আগে যাবে—একটু গাওনা বাজনার আয়োজন করবো। কিরে পিংলা, নাচত্যা পারবি তো?

—আমার চেয়ে কাজলি তো ভালো নাচে। উ নাচবেক—

কাজলি লজ্জা পেয়ে সরে যায়। পিংলাও তার পিছু ছোটে। হিন্দোল হো হো করে হেসে ওঠে।

গগন বলে, হাস্তো কেনে?

হিন্দোল বলে, আজ তো হাসির দিন। আমার ভাই-এর বেটা আইছ্যা—হাসবো, নাচবো—চিলকিগড়ে জংলী মানুষের যে আজ বেবাক খুশীর দিন। এ্যাই চন্দরা, আমার মাদলটা নিয়ে আয়—বাজাই।

চন্দরার অপেক্ষা করে না হিন্দোল। নিজেই যায়। মাদল এনে বাজাতে আরম্ভ করে।

মাদলের আওয়াজে পাড়ার আরো মানুষ ছুটে আসে। হিন্দোলের বাড়ির উঠোনে রীতিমত ভিড় জমে যায়।

দেখে শুনে জঙ্গল অবাক হয়ে যায়। এমনধারা জীবনের কথা তার জানা নেই। এখানে যেন আর এক জীবনের মেলা। শাল মহুয়ার অরণ্যের মধ্যে এ যেন আলাদা একটা জগৎ। এখানে আর কিছু না থাক, অফুরন্ত আনন্দ আছে। যে আনন্দ নেশা জাগায় মনে।

সারাটা দুপুর ঘুমিয়ে কাটালো জঙ্গল। বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙতে দেখলো পিংলা মাথার কাছে বসে আছে।

উঠে বসলো জঙ্গল। পিংলার দিকে চেয়ে দেখলো। বড় ভালো লেগেছে তার এই ছোট বোনটিকে। চন্দরা ভাইটিও ভালো। ভালো এ বাড়ির সবাই। কাকা কাকিমা ঠিক যেন বাবা মা'র মতন। বাবার কথা জানে না জঙ্গল, শুনেছে মায়ের মুখে। বাবার দেহটাও যেমন বড়ো ছিল, তেমনি ছিল মনটাও। হিন্দোল কাকার দেহটা ছোট, কিন্তু মনটা বড়ো। আর কাকিমা তো মায়েরই মতো। জঙ্গলের কষ্ট হবে, রাত জেগে এসেছে, তাই সকাল সকাল খাইয়ে নিজে খাটিয়ায় বালিশ দিয়ে বলেছে, ঘুমো।

ঘুমের ব্যাপারে ওই এক মানুষ জঙ্গল। ঘুম যেন ওর হাতধরা। যখন খুশী, ইচ্ছে মাফিক ঘুমোতে পারে। আবার দু-দিন না ঘুমিয়েও কাটাতে পারে।

ঘুম থেকে পিংলাকে দেখেই জঙ্গল জিজ্ঞাসা করলে, বনে বেড়াতে যাবি না?

পিংলা বলে, না। আজ আর বনে যাবো নাই। কাজলিদের ঘরকে যেতে হবেক। আচ্ছা জঙ্গল দাদা—তুর মাকে আমার জেঠিকে আনলি না কেনে?

—নিয়ে আসবো রে, নিয়ে আসবো—এখানে ঘর বাঁধবো পিংলা।

—ঘর বাঁধতে হবেক কেনে? ইখানে তো ঘর আছে। তুই কি আলাদা যে ঘর বানাতে হবে। অমন কথা বলিস নাই।

জঙ্গল তার কথা ফিরিয়ে নেয়। আমার ভুল হয়েছে রে পিংলা।

—ভুল তো হইছ্যা। এই জঙ্গলের দেশে মানুষের মন ছোট নয় রে—

—আমার মনও ছোট নয় রে পিংলা।

—ছোট হবে কেনে। ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতির মন কি ছোট হয় রে! তুই ঘুম দিচ্ছিলি, আর আমি তুকে দেখছিলাম—ভারী সোন্দর লাগছিল রে।

—আমাকে জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে যাবি তো?

—জঙ্গল দাদা জঙ্গলে বেড়াবে। তুর ও নাম বাতিল করে দে।

—কেন, নামটা খারাপ কিসে?

—ভালো নয়—আমি কেন, কাজলিও বলেছে!

—কাজলি বুঝি তোর বন্ধু।

—বন্ধু হবে কেনে, উ আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো। উকে আমার খুব ভালো লাগে, আর উ আমাকে খুব ভালোবাসে। আমরা একসঙ্গে বনে যাই, ফল ফুল নিয়ে আসি, কাঠ কুড়াই—জানিস দাদা, কত দিন বেড়াতে বেড়াতে ধলভূমগড়ের পাহাড়ে চলে যাই—তুকে একদিন নিয়ে যাবো।

পিংলার মা এসে দাঁড়ায়। হাতে চায়ের বাটি।

জঙ্গল বলে, আমার চায়ের নেশা নেই কাকি।

চায়ের বাটি হাত পেতে নেয় জঙ্গল। মা চলে যেতে পিংলা অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তু বিয়া করছিস দাদা?

—না। ছোট্ট কথায় জবাব দেয় জঙ্গল।

পিংলার দুচোখ হঠাৎ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জঙ্গলের সে দিকে লক্ষ্য নেই, সে আপনমনে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে চলেছে।

বনের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাটির বাড়ি।

প্রতিটি বাড়ি পরিষ্কার, ঝকঝকে। বাড়ির দেয়ালে নানারঙের আলপনা দেওয়া। লতা-পাতা, পশু-পক্ষী আঁকা।

বেশ খানিকপথ এসে গগন পাহাড়ীর বাড়ি। গগন পাহাড়ী বাড়ির উঠোনে খাটিয়া পেতে বসে আছে। আরো জন তিনেক বসে তাকে ঘিরে।

জঙ্গলকে নিয়ে পিংলা আর চন্দরা এলো। হিন্দোল পরে আসবে। গরু-বাছুরের খাবার দিয়ে, হাঁস মুরগী তুলে তবে সে বেরোতে পারবে। জঙ্গল আসতেই গগন উঠে দাঁড়ায়। বলে, আয়রে—তর জন্যে সন্ধ্যের আগে থেক্যে বস্যে আছি। এ্যাই পিংলা—এতো দেরি করলি কেনে ?

পিংলা বলে, দেরী কই, এই ত্যে সইন্ধ্যে হলো।

গগন নিজে হাত ধরে বসালো জঙ্গলকে। বললে, তুর নাম আমি বদলে দেবো—জঙ্গলের দেশে জঙ্গল নাম মানায় নারে—

পিংলা বাড়ির মধ্যে যায়। কাজলির হাত ধরে টেনে আনে।

কাজলি আজ মনের সাধ মিটিয়ে সেজেছে। পরেছে গাঢ় লালরঙের আলতাপাড় শাড়ী। বক্ষবাস নেই, শাড়ীর আঁচল আঁটসাঁট করে টেনে দিয়েছে বুকের ওপর দিয়ে। মাথায় দিয়েছে নানারঙের ফুল। হাতে রূপোর বালা, পায়ে মল, কপালে কাঁচপোকার টিপ। দু চোখে টেনেছে কাজল রেখা।

কাজলিকে নিয়ে পিংলা এসে দাঁড়ায় জঙ্গলের সামনে। জঙ্গল একবার চেয়ে দেখে মাথা নীচু করে।

কাজলি তার বন্ধুদেরও বলেছে। তারা এক এক করে এলো। মতিয়া, সোনা, রঙিলা, টোনা—এরা পিংলারও বন্ধু—তবে পিংলা এদের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট।

গগনের বেটা ইন্দর কারবাইডের গ্যাসের আলো জ্বেলে দেয় উঠোনে। পাঁচ সাতখানা খাটিয়া পাতা—তার ওপর বসে সবাই। গগন দুটো হাঁড়িয়ার কলসি আর কাঁচের গ্লাস বার করে আনে। জঙ্গল একবার কলসি দুটোর দিকে ফিরে তাকায়। তারপর গগনের বৌ শুনি নিয়ে আসে ধামা ভর্তি মুড়ি আর পেঁয়াজ ভাজা।

সবই তৈরী। এখন শুধু হিন্দোল আসার অপেক্ষা। গগন একটু এগিয়ে গিয়ে হাঁক পাড়লো হিন্দোলের নাম ধরে।

জমে ওঠে আসর। জঙ্গলের হাতেই প্রথমে পান পাত্র তুলে দেয় কাজলি

জঙ্গল পানপাত্র হাতে নিয়ে ইতস্তত করে। মান্যিজনের সামনে এভাবে হাঁড়িয়া খাওয়া—ভাবতেই কেমন অস্বস্তি তার।

হিন্দোল বলে, অরে এ হলো জঙ্গলের দেশ, আমরা সবাই জংলী—এখানকার কানুনই আলাদা—নে খা।

জঙ্গল পানপাত্র হাতে তুলে নেয়। নিঃশেষে পান করে সবটুকু। এর স্বাদই যেন আলাদা। মিষ্টি অথচ ঝাঁঝালো। জঙ্গল একবার মুখ তুলে তাকায়। এখনো রঙ ধরেনি চোখে।

এবারে পানপাত্র হাতে হাতে ফেরে। কেউ বাদ যায় না। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সবাই মেতে ওঠে।

দু কলসি হাঁড়িয়া—সহজে শেষ হবার নয়। অথচ শেষ না করে ছাড়বে না। প্রয়োজন হলে আরো আছে। আরো দু'চার কলসি এসে যাবে।

জঙ্গল পাঁচ গ্লাস পান করলো। কিন্তু এখনো তার চোখ লাল হয়নি। এখনো মনে রঙ ধরেনি। অথচ দু তিন গ্লাস করে টেনে সবাই কেমন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। পিংলা তো খাটিয়ার ওপর ঘাড় গুঁজে পড়েছে। গগন টলতে টলতে কাঞ্চন ফুলের গাছ জড়িয়ে ধরে হাসছে। কাজলি দাঁড়াতে পারছে না। চন্দরা, ইন্দর, সোনা. টোনা—সবাই বেসামাল হয়ে পড়েছে। কিন্তু জঙ্গল তখনো মেরুদণ্ড সোজা করে বসে আছে।

হিন্দোল বলে জড়িত কণ্ঠে, হাঁ ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বটে। এক কলসি হাঁড়িয়া পেটের মধ্যে গেলেও পা টলতো না তার—

বলে জঙ্গলকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে।

জঙ্গল অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

হাঁড়িয়ার স্বাদটা মনে ধরেছে জঙ্গলের। কাজলি গ্লাস ভরে টলতে টলতে এগিয়ে আসে জঙ্গলের কাছে। গ্লাস হাতে তুলে নেয় জঙ্গল।

গ্লাসের পর গ্লাস—কলসির বাকি হাঁড়িয়াটুকু জঙ্গলই শেষ করে দেয়। এত ক্ষণে তার মনে রঙ ধরে। চোখ দুটো লাল হয়। কিন্তু তার মধ্যেও মনের রাশটাকে টেনে রাখে ইচ্ছে শক্তি দিয়ে। মাতাল হবে না সে।

—কি র‍্যা কাজলি, হিন্দোল জড়িতকণ্ঠে বলে, মাদল বাজা, নাচ, সব যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মাদল বাজলো। বাজলো ঢোলক। জোয়ান বয়সের ছেলে-মেয়েগুলো হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে গেল। শুরু হলো নাচ। নাচের সঙ্গে গান। গগন পাহাড়ীর বাড়ির উঠোনে রীতিমত উৎসব শুরু হয়ে গেল।

জঙ্গলের দুচোখে রঙ ধরেছে। সে ফিরে ফিরে দেখছে সবাইকে। কিন্তু কাজলির ওপর চোখ পড়লে চোখ ফেরাতে পারছে না।

জঙ্গলের দৃষ্টি স্পর্শ করছে কাজলির বুক, মুখ—কিন্তু তার পায়ে যখনই চোখ পড়ছে, তখনই যেন জঙ্গলের রক্তটা নেচে উঠছে।

নাচের মধ্যেও কাজলির মাতাল-চোখ বার বার এসে পড়ছে জঙ্গলের ওপর। আর জঙ্গল সেই মুহূর্তে অনুভব করছে তার রক্তের শিহরণ। আর মনের মধ্যে অনুভব করছে অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ।

নাচের ছন্দে কাজলির উন্নত বক্ষদেশ ওঠা নামা করছে, কোমরে তরঙ্গ উঠছে, আর উরুগুলো থর থর করে কাঁপছে। জঙ্গলের দু'চোখে নেমে আসে রঙিন স্বপ্ন—কাজলির ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না সে। আর মনটা থেকে থেকে কেমন উথালিপাথালি করে উঠছে।

বর্ষায় দুরন্ত রায়মঙ্গলের কথা মনে পড়ছে জঙ্গলের। দুরন্ত গাঙ বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠে, জোয়ার এলে দুকুল ছাপিয়ে যায়। বর্ষায় রায়মঙ্গলে যেন যৌবনের ঢল নামে। কিন্তু কাজলির যৌবন আরো দুরন্ত। জঙ্গলকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

জঙ্গল উঠে দাঁড়ায়। মন তার মাতাল হয়েছে। কিন্তু দেহটা সিধে। বিন্দু-মাত্র পা টলে না তার। বেশ সহজ ভাবে এগিয়ে যায়। নাচের নেশা পেয়ে বসেছে তাকেও। কিন্তু সে তো নাচতে জানে না। অথচ নাচতে ইচ্ছে করছে।

চক্রাকারে নাচছে পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা। মাঝে খাটিয়ায় বসে আছে গগন, হিন্দোল। দুজনেই নেশায় বুঁদ হয়ে বসে মাদল আর ঢোলক বাজাচ্ছে।

জঙ্গল এবারে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। নাচতে না জানলেও সে-ও এদিক ওদিক ঘুরপাক খায়। টোনা এক সময়ে হাতের বন্ধনী ভেঙে জঙ্গলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। জঙ্গলও তখন শিকলির মধ্যে এসে পড়ে। সে-ও বৃত্তের সঙ্গে আবর্তিত হয়।

জঙ্গলের একটা হাত ধরেছে টোনা—আর একটি হাত ইন্দর। নাচের তালে পা মেলাতে চেষ্টা করে। তাল কেটে যায়। চেষ্টা করে কোমর দোলাতে, কিন্তু পারে না।

মাদল, ঢোলক বাজাচ্ছে গগন আর হিন্দোল। গুরুগম্ভীর তার আওয়াজ। জঙ্গল নাচের তালে পা মেলাতে না পারলেও, তার মন ময়ূরের মত পাখা মেলে নাচছে।

এক সময়ে নাচের আসরে এসে দাঁড়ায় গগনের বৌ আর পিংলার মা। গগনের বৌ-এর কথা শোনা যায়, তুমারা খাবেক নাই, শুধু নাচলে চলবেক ?

নাচ থেমে যায়। সত্যি রাত হয়েছে অনেক।

গগন মাদল রেখে জড়িয়ে ধরে জঙ্গলকে। সাবাস বেটা সাবাস—এক কলসি হাঁড়িয়াতে তোর পা টললো না—তুই ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বটে।

উঠোনের মাঝখানে গ্যাসের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে জঙ্গল। তার মাথার বাবরি চুলের খানিক উড়ে এসে পড়েছে কপালের ওপর। তারই আড়াল থেকে তার ঢলঢলে দুটি চোখ দেখা যায়। যে চোখের দৃষ্টি অতল গভীর। যে চোখ উদাস সুন্দর।

জঙ্গলের দুচোখ একসময় কাজলিকে স্পর্শ করলো।

কাজলি দাঁড়িয়ে আছে। কালো মেয়ে কাজলি। নিখুঁত তার গড়ন। তার কালো-কোঁকড়া চুলের ময়ূরখোঁপায় এক গুচ্ছ ফুল। তার টানাটানা ডাগর দুটি চোখে যেন যাদুর মায়া জড়ানো।

জঙ্গলের মাতাল মন হঠাৎ কেমন উথালি-পাথালি করে ওঠে। তার রক্তে লাগে নাচন। শেষটা মন ডিঙি এই ঝড়ে না ডুবে যায়।

কাজলি দৃষ্টি নত করে। জঙ্গলও তার মনের রাশ টেনে ধরতে চেষ্টা করে।

কিন্তু কাজলির দুচোখে যেন যাদুকরীর মায়া। সে দুটি চোখের চকিত চাহনি জঙ্গলকে অবসন্ন করে তোলে।

জঙ্গলের চোখ বারবার কাজলির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। এ যেন গাঙের এপারের ঘাট থেকে ওপারের ঘাটে খেয়া ডিঙি নিয়ে বার বার আসা-যাওয়া করা।

– এ্যাই দাদা, পিংলার কণ্ঠে চমক ভাঙে জঙ্গলের। কি দেখিস র‍্যা অমন কর‍্যা ?

জঙ্গল ফিরে চায় পিংলার দিকে।

পিংলা মুচকি হেসে চুপি স্বরে বলে, তোর মনে রঙ লাগছ্যা, নারে। রামধনু উঠেছে তোর মনের আকাশে ?

জঙ্গল চুপ করে থাকে। পিংলা তখনো মুখ টিপে হাসছে।

॥ দশ ॥

শাল-মহুয়ার অরণ্যের দেশ জঙ্গলকে যাদু করেছে।

এখানকার বনভূমি উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো মাঠ, প্রান্তর—এখানকার মানুষ সব কিছুকে ভালোবেসে ফেলেছে সে। তার মনের ওপর ছায়া ফেলেছে কাজলি নামে মেয়েটা। এ ছায়ার রঙ কালো নয়—নানারঙে রঙিন।

সেদিন উঠোনের কোণে লাউমাচার নীচে দড়ির খাটিয়ায় বসে নিজের কথাই ভাবছিল জঙ্গল। নিজের কথার সঙ্গে অনেক কথাই মিশে আছে। এ দেশের মাটির সঙ্গে যে তার রক্তের যোগ—আর সেই টানেই তো সে এসেছে। এসেছে কদিন, দেখেছে অনেক কিছু, কিন্তু আসল দেখাটা বাকি আছে। হিন্দোল বলেছে, আজই সে তাকে নিয়ে যাবে চিলকিগড়ের রাজবাড়ি। রাজবাড়ির দরদালানে তার ঠাকুর্দা ঈশ্বর পাহাড়ীর ছবি আছে। সে ছবির কথা মা'র কাছে শুনেছে সে।

কিন্তু কাকা এখনো আসছে না কেন!

জঙ্গলের মন অশান্ত হয়ে উঠেছে। ঠাকুর্দার ছবি না-দেখা পর্যন্ত সে মন শান্ত হবার নয়।

বেলা গড়িয়ে যেতে হিন্দোল এলো। এসেই ডাক দিলে জঙ্গলকে। যাবি তো রাজবাড়ীতে?

—যাবো বৈকি।

—চল।

ওরা বেরোবে এমন সময় পিংলা কোত্থেকে ছুটে আসে। আমি যাবো নাই?

—যাবি তো চল। হিন্দোল বলে, তুই যা-না, আমি বরং শুকনো কাঠ গুলো চেলা করে দিই।

—তাই চল দাদা।

জঙ্গলকে নিয়ে পিংলা চলে যায়। হিন্দোল আর গেল না।

ডুলুং নদীর পারে চিলকিগড়ের রাজবাড়ি।

বিরাট বাড়ি। জীর্ণ। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই গোছের ব্যাপার।

শুধু বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। রাজাবাবুরা কলকাতায় থাকেন, কেবল পূজোর সময় আসেন। বাড়িতে এখনো ধুমধাম করে পূজো হয়।

রাজবাড়ির পুরনো আমলের কর্মচারী মুকুন্দ মাহাতো। বৃদ্ধ। বয়েস আশী পেরিয়ে গেছে, তবু দেহের বাঁধন অটুট। মাথার চুল কাশফুলের মতো সাদা—একটি দাঁতও পড়েনি। শুধু দৃষ্টি শক্তিটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। নাকের ডগায় পুরু লেন্সের চশমা। চশমা দিয়েও ভালো দেখতে পায় না।

মুকুন্দ মাহাতো সদরের সিংহদরজার সামনে একটা ষাঁড়কে বাঁশপাতা খাওয়াচ্ছিলেন। ষাঁড়টি রাজবাড়ির ধর্মের ষাঁড়। বুড়ো রাজার শ্রাদ্ধে ওটা দেয়া হয়েছিল। বুড়ো রাজা মারা গিয়েছিলেন এখানে।

পিংলা আর জঙ্গল এসে দাঁড়ায় মুকুন্দ মাহাতোর সামনে।

মুকুন্দ মাহাতো ফিরে তাকায় জঙ্গলের দিকে। কাছে এসে খুঁটিয়ে দেখে জঙ্গলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার দুচোখ বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। তুই কে বটে ?

উত্তর দেয় পিংলা।—এ আমার দাদা। ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি।

—তাইতো মনে লাগে বটে। মুকুন্দ বলে ওঠে, উ এসে দাঁড়ালো, আমার মনে হলো, বুঝি ঈশ্বর পাহাড়ী আইছ্যা। চোখে ভালো দেখি না—যা দেখি তাতেই মনে দোলা লাগে।

এবারে মুকুন্দ আরো কাছে এগিয়ে যায়। জঙ্গলের মুখটাকে আরো ভালো করে দেখে। বলে, হাঁ—এ ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বটে। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই রকম কোঁকড়া চুল ঘাড় অব্দি লুটিয়ে পড়েছে।

জঙ্গল মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। কতক্ষণে সে দেখবে তার ঠাকুর্দা ঈশ্বর পাহাড়ীর ছবি।

—এ তো দেখি ঈশ্বর পাহাড়ীই ফিরে আইছ্যা। মুকুন্দর মনে চাপা উত্তেজনা। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে তার। জঙ্গলের দুটি হাত দুহাতের মুঠোয় নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, তোর নাম কি র‍্যা ?

—জঙ্গল পাহাড়ী।

—ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি জঙ্গল পাহাড়ী—তুই মরদ বটে। সে-ও এমনি মরদ ছিল। মরদের নাতি মরদ।

পিংলা বলে, দাদা উয়ার ঠাকুর্দাকে দেখে নাই, দেখতে আইছ্যা।

—দেখবেই তো। উয়ার ঠাকুর্দাকে তো দেখবেই, আয় আমার সঙ্গে।

রাজবাড়ির বারমহলে বিরাট দরদালান। তালা বন্ধ ছিল। খুলতেই এক পাল চামচিকে বেরিয়ে আসে। সেই সঙ্গে একটা বোটকা গন্ধ।

ঘরের দেয়ালে টাঙানো রাজবাড়ির পুরনো আমলের মানুষদের ছবি। কেউ রাজা, কেউ রাণী, কেউ রাজপুত্তুর। তারই মধ্যে ঈশ্বর পাহাড়ীর ছবি। জঙ্গল নিজেই চিনে নেয় তায় ঠাকুর্দাকে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ছবির সেই দশাসই চেহারার মানুষটার দিকে।

ছবির মানুষটার দিকে চেয়ে থাকতে জঙ্গলের মনে হয়, সে যেন নিজেকেই দেখছে।

ঈশ্বর পাহাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। একটি পা মৃত বাঘের পিঠে, হাতে ধারালো বর্শা, চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে। ছবির মানুষটার পরনে মালকোঁচা দিয়ে পরা কাপড়, খালি পা, হাতে ধরা বর্শা, আর মাথায় বাবরি চুলে বাঁধা লাল ফিতে।

ঈশ্বর পাহাড়ীর ছবির সামনে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গল। তারপর প্রণাম করে। দীর্ঘ প্রণাম যেন শেষ হয় না।

পিংলা ডাকে, ছোট দাদা—কি হলো র‍্যা?

জঙ্গল ফিরে তাকায়, তার দুচোখে তখন জল টলমল করছে।

মুকুন্দ বলে, জঙ্গল তোকে দেইখ্যা আমার প্রাণ ভর‍্যা গেল। জানিস তোর ঠাকুদার স্যাঙাত ছিলাম আমি। আমার থ্যাক্যা দু'বছরের বড়ো ছিল সে।

মুকুন্দ মাহাতোর দুচোখে জলের ঢল নামে। হয়তো পুরনো দিনের কথা তার মনকে সিক্ত করে তুলেছে। ভাঙা ভাঙা গলায় মুকুন্দ বলে, হ্যাঁ রে জঙ্গল তুই এখানে থাকবি তো?

জঙ্গল বলে, না—ঘরে ফিরতে হবে আমায়। আমার আসা মানে ঠাকুর্দার দেশটা দেখতে আসা। জীবনে তো দেখিনি। আর দু'দিন বাদেই চলে যাবো।

পিংলা বলে, তুই কি বলিস বটে? এখন যাওয়া হবেক নাই, তোকে থাকতে হবে কালীপুজার পর ভাইফোঁটা তক, যেতে হয় তারপর যাবি।

জঙ্গল এখন যাওয়ার কথা আর নতুন করে বললো না। এ দেশ ছেড়ে যেতে তারও মন চাইছে না। কিন্তু ফিরে তো তাকে যেতেই হবে।

আবার নতুন করে জঙ্গল ফিরে চায় ছবির মানুষটার দিকে। এ তল্লাটে রূপকথার মতো ছড়িয়ে আছে মানুষটার কথা। যে সব কথা মায়ের কাছে শুনেছে, আবার এদেশে এসেও শুনছে। তারপর তার বুকটা ভরে যায় ঠাকুর্দার ছবিটা দেখে। রাজারাজড়ার ছবির মধ্যে ঈশ্বর পাহাড়ীর ছবি। এ কি কম কথা।

—চল, ঘরে চল। পিংলা বলে, আঁধার হয়ে আসছে। ছবির মানুষটারে আর তো দেখতে পাবি না। এবার ঘরে চল।

—ঘরে নয়, বনে। জঙ্গল বলে, চল পিংলা বনে যাই।

ঢুলুং পেরিয়ে পাহাড়ী গাঁয়ের পথ। বনের মধ্যে দিয়েই চলে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে বন-পথে। সে অন্ধকার ঘন কালো। নীড়ে ফেরা পাখিরা ডাকছে। পিংলা আর জঙ্গল দুই ভাই-বোন নীরবে পথ হেঁটে চলেছে।

যে পথ গাঁয়ের দিকে গেছে, সে পথে গেল না ওরা। এলো অন্য পথে বনের গভীরে। বসলো দু'জনে একটা টিলার মতো জায়গায় মহুয়া-চারার পাশে।

জঙ্গল বলে, জানিস পিংলা—ঘরে ফিরে আর মন টিঁকবে নারে।

পিংলা বলে, বেশ তো পাহাড়ী গাঁয়ে ঘর বাঁধ না, ঘর থেকে মাকে নিয়ে আয়। আর কাজলিকে তো তোর মনে ধরেছে।

কাজলির কথায় জঙ্গলের মনটা একটু চঞ্চল বৈকি। সে চাঞ্চল্য তার মনে। বাইরে প্রকাশ নেই। মুখে বলে, নতুন করে আর আমি ঘর বাঁধবো না, আর এ জীবনটার ভাগ আমি কাউকে দেবো না—আমি একা থাকতে ভালোবাসি, একা থাকতে চাই—

পিংলা বলে, ওটা তোর মুখের কথা—মনের কথা নয়। আমি জানি কাজলি তোর মনে রঙ ধরিয়েছে।

জঙ্গল চুপ করে থাকে।

পিংলা বলে, কথা বলিস না যে?

জঙ্গল বলে, কি বলবো—সব কথা কি বলা যায় রে। আমার মনটারে আমি জানি—সে মন ছন্নছাড়া, সে মন শুধু ছুটতে ভালোবাসে, স্থির থাকতি চায় না।

পিংলা ফিরে চায় জঙ্গলের মুখের দিকে। যদিও কথা বলছে, তবু অন্যমনস্ক জঙ্গল। সে যেন ভিতর-মনে আর কিছু ভাবছে।

জঙ্গল তখন ভাবছে তাদের বংশের ওপর পুরনো অভিশাপের কথা। তার ঠাকুর্দা ঈশ্বর পাহাড়ীর গর্ভবতী বাঘিনীকে মেরেছিল, তারপরেই অভিশাপ নেমে আসে। ঠাকুরর্দা মরে যায় সেই অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে, বাবাও চলে যায়। তার পরের কথা ভাবতে অস্থির উত্তেজনা জাগে জঙ্গলের মনে। দুচোখে

জলে আগুন। সে যদি মওকা পায়, দেখিয়ে দেবে কত বড়ো একটা মিথ্যের বোঝা তাদের বংশের মাথায়।

—চল, এবারে ঘরে যাই।

—চল।

বনের পথ দিয়ে পাহাড়ী গাঁয়ের দিকে ফিরে চলে ওরা।

কদিনে এ তল্লাটের বনের পথঘাট রপ্ত করে ফেলেছে জঙ্গল। সঙ্গে কেউ থাক না থাক - সে একাই বেরিয়ে যায়, ঘুরে বেড়ায় বনে-বনান্তরে।

তারপর এই জঙ্গল মহলে এখন আর অজানা অচেনা কেউ নেই। পাহাড়ী-দের ঘরে ঘরে তার ঘর। সবাই তাকে কাছে টেনে নিয়েছে ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বলে। আর নিমন্ত্রণ তো লেগেই আছে। এক-এক বাড়ি এক-একদিন উৎসব লাগে। জঙ্গলকে ঘিরেই উৎসব। সন্ধ্যের পর থেকে আসর জমে যায়। হাঁড়িয়া ভরা কলসি তো থাকেই আসরে। যার যত খুশি পান করো, তারপর নাচ গান তো আছেই।

এত হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে জঙ্গলের ভালো লাগে না। কিন্তু না থেকে উপায় নেই। যখন তাকে গাঁয়ের মানুষ 'এ ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বটে' বলে জড়িয়ে ধরে, তখন সে সব কিছু ভুলে যায়। তারও বুক বাজিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ঈশ্বর পাহাড়ী তস্যপুত্র দুর্জয় পাহাড়ী, তস্যপুত্র জঙ্গল পাহাড়ী—এই আমি।

এখানে নিজের ইচ্ছে ভুলতে হয়েছে, তাকে পাক খেতে হচ্ছে সবার ইচ্ছেয়।

সেদিন বিকেল।

একাই ছিল জঙ্গল। শুয়ে ছিল দড়ির খাটিয়ায় শাল-মহুয়ার বনের দিকে তাকিয়ে।

হঠাৎ কি হলো, উঠে পড়লো। সুন্দর সবুজ বন যেন তাকে ইশারায় ডাকছে। আস্তে আস্তে সে চললো বনের দিকে। পিংলা বাড়ি নেই, থাকলে সে ঠিকই সঙ্গ নিত। পিংলা গেছে গিধনির হাটে আতা বেচতে। চন্দরাও খানিকটা মাছ ধরে নিয়ে গেছে কায়েতপাড়ায় বিক্রী করতে।

কিছু পথ এসে একটা ছোট্ট টিলা। টিলার ওপর দাঁড়ালে বহুদূর চোখ যায়। চোখে পড়ে ঢেউ খেলানো বনভূমি। ধলভূমগড়ের পাহাড়গুলোকেও দেখা যায়।

জঙ্গল টিলার ওপর উঠে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে। শাল, পিয়াশাল, মহুয়ার অরণ্যদেশ—যেন এক স্বপ্নের মায়াপুরী।

খানিকসময় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখলো। তারপর একটা গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে পড়লো।

এতসময় মনের মধ্যে কোনো চিন্তা ছিল না। এবারে কোথা থেকে চিন্তা এসে জুটলো তার মনের মধ্যে। মনে পড়ছে বাড়ির কথা। মা, দ্বিজু, ওসমান চাচা—তারপর আরো কতো কাছের মানুষ। মনে পড়ছে অথৈ জলের রায়মঙ্গল. বিদ্যা, কালিন্দী, বাঘনা, মনে পড়ছে বাদা-বনের কথা।

এই মুহূর্তে বাড়ির জন্যে তার মনটা আঁকুপাঁকু করছে। আবার এ দেশটা ছেড়ে যেতে হবে, একথাও ভাবতে চাইছে না সে।

মা কি করছে এখন?

নিশ্চয়ই গোয়ালে গরু তুলে জাবনা দিচ্ছে। নয়তো হাতের কাজ ভুলে বসে বসে ছেলের কথা ভাবছে। ছেলের কথা ভাবতে হয়তো মায়ের চোখে জল ঝরছে।

দ্বিজুটা ঠিকমতো কাজটাজ করছে তো! ও আবার যে রকম ন্যাদাভোলা, বুদ্ধি ভাঙিয়ে কিছু করতে পারে না নিজে থেকে।

ওসমান চাচা যখন আছে কোনো চিন্তা নেই। মাকে তো জানে—নিজের ছেলের ওপর যত না ভরসা, তার বেশী ভরসা চাচার ওপর। ওসমান চাচা আছে বলেই তো বাদাবনের দেশে তাদের এতো বল।

ঘরের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে জঙ্গল।

সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে অরণ্যের আড়ালে। দিনশেষের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বনের দেশে।

বাতাসে শীতের আমেজ। এই আমেজটুকু ভারি মিষ্টি। জঙ্গল দেহটাকে আরো শিথিল করে দেয়। শুয়ে পড়ে মাটির ওপর। দৃষ্টি তার আকাশের দিকে। যে আকাশে টুকরো মেঘেরা আসন্ন সন্ধ্যার রঙ মেখে ভেসে বেড়াচ্ছে। যে আকাশে ডানা মেলে ক্লান্ত পাখিরা বাসায় ফিরে আসছে।

জঙ্গলের মনটাও ঘরে যাবার জন্যে উন্মুখ।

নারীকণ্ঠের উচ্ছল হাসিতে জঙ্গলের চমক ভাঙে। শুয়ে ছিল, উঠে বসে।

কাজলি আসছে। মাথায় শুকনো কাঠের বোঝা। আঁচলে বাদাবনের ফুল

কাছে আসে কাজলি। শুকনো কাঠের বোঝা নামিয়ে রেখে দুহাত কোমরে দিয়ে দাঁড়ায়। আঁচলের বাঁধন আলগা হয়ে গেছে, কয়েকটা ফুল পড়ে যায় মাটিতে।

জঙ্গলের দৃষ্টি কাজলিকে ছুঁয়ে আছে।

যৌবনের ঢল নেমেছে কাজলির অঙ্গে অঙ্গে। দুরন্ত যৌবন যেন উপচে পড়ছে। এ যেন বর্ষায় ভরা রায়মঙ্গল। একূল ওকূল ছাপিয়ে যেতে চাইছে, ভাসিয়ে দিতে চাইছে আশপাশের সব কিছু।

—তুই একা বস্যা আছিস কেনে? কাজলি জিজ্ঞাসা করে

—মন ভাল নেই। জঙ্গল উত্তর দেয়।

—কেনে! কি হলো তোর মনে? দাগা দিছ্যা কেউ?

জঙ্গল চুপ করে থাকে।

—ঘরে কে আছে তোর, যার জন্যে মন খারাপ হইছ্যা? বৌ আছে, পীরিতের বৌ—সোহাগী বৌ?

—ঘরে আমার মা আছে।

—বৌ নাই তো বটে। আঁচল থেকে কাজলি মুঠো ভর্তি ফুল ছুঁড়ে দেয় জঙ্গলের গায়ে মাথায়। বলে, কি র‍্যা, অমন কর‍্যা দেখিস কেনে!

—দেখতি ভালো লাগছে তাই।

—মর‍্যা যাই আর কি। কাজলি হেসে ওঠে। উচ্ছ্বসিত হাসি। হাসির তুফানে তরঙ্গ ওঠে তার অঙ্গে অঙ্গে।

শান্ত গাঙে তরঙ্গ উঠলে তার চেহারাই বদলে যায়। জঙ্গলের কাছে এ নতুন কিছু নয়। সে তো গাঙ দেশেরই মানুষ। কিন্তু এমন টলমল যৌবন সে এর আগে দেখেনি।

এবারে কাজলি বসে পড়ে জঙ্গলের পাশে। বলে, এ দেশটা তোর ভালো লাগছ্যা রা?

—হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে।

—মিছা বলছিস তুই।

—মিছে কথা আমি বলি নে কাজলি।

—অ তাই বুঝি। কাজলি আরো খানিকটা ফুল ছুঁড়ে দেয় জঙ্গলের গায়ে। তারপর জঙ্গলের পাশে আরো নিবিড় হয়ে বসে। বলে, আমার চোখের দিকে চেয়ে দ্যাখ।

জঙ্গল ফিরে চায় কাজলির মুখের দিকে। কাজলির ডাগর চোখে চোখ

পড়তেই তার রক্তে বান ডাকে। দুরন্ত সে বান। যৌবনের বান। তাকে না ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

কাজলির দুটি চোখ নেচে নেচে ওঠে।

শিউরে উঠে জঙ্গলের দেহমন। এবারে চোখ দুটি নেমে আসে আপন বুকের দিকে। যে বুকে দুরন্ত যৌবন টলমল করছে।

বাদাবনের দেশের ডাকসাইটে মরদ জঙ্গল। ডরায় না ঝড় তুফানে। সুন্দর বনের রাজা বাঘের এলাকায় ঢুকতেও তার বুক কাঁপে না। কিন্তু হঠাৎ কি হলো তার! মনের রাশ টেনে ধরে রাখতে পারছে না। এখনি হয়তো ভরা গাঙের ঘূর্ণিতে তলিয়ে যাবে সে। মরণ হবে জেনেও তার তলিয়ে যাবার ইচ্ছে।

—তোর নাম জঙ্গল নয় রে। কাজলির চোখ জঙ্গলের চোখে। তার নিঃশ্বাস বিলম্বিত অথচ গভীর। সে আরো ঘন হয়ে বসে। যদিও তার কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা—তবুও স্পষ্ট।—আমি তোর নাম রাখলাম সুন্দর—তুই সুন্দর পাহাড়ী।

জঙ্গল নীরব। দুরন্ত ঘূর্ণিতে হারিয়ে যাবার আগেও তার বাঁচার ইচ্ছে।

—সুন্দর!

কাজলি তার আবেগ-থরথর মুখখানা এগিয়ে দেয়। তার ঠোঁট কাঁপছে, গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার যৌবন-টলমল বুক ওঠা-নামা করছে।

—তুই সুন্দরী।

—তুই সুন্দর। কাজলির মুখখানা নুয়ে পড়ে জঙ্গলের বুকের বুকের কাছে। আর জঙ্গলের দুটি হাতও আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় কাজলিকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে।

আর কাজলিও তার যৌবনবতী অঙ্গের পসরা তুলে দিতে চায় সুন্দর পুরুষের কাছে।

চটুল হাসির ঝঙ্কার ওঠে। সচকিত জঙ্গল আর কাজলি দুজনে একই সঙ্গে ফিরে চায়।

একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে পিংলা।

—পিংলা!

জঙ্গল আর কাজলির কণ্ঠে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

হাসতে হাসতে পিংলা এগিয়ে আসে। কাজলি তখন লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে পড়েছে। কিন্তু নিজের অবিন্যস্ত শাড়ী গুছিয়ে নিতে ভুলে গেছে। কখন যেন বুক থেকে খসে পড়েছিল নীলশাড়ীর আঁচল, কখন যেন শাড়ীর বন্ধনী খুলে গিয়েছিল নাভিদেশ থেকে—সে যেন কিছুই জানে না।

পিংলা এসে বসে জঙ্গলের মুখোমুখি। বলে, কি দাদা—চিনতে পারিস তো ? আমি তোর বোন পিংলা।

জঙ্গল এখনো বলার মতো কথা খুঁজে পায় না।

পিংলা এবারে কাজলিকে আড়াল করে বসে, একটা হাত পিছনে এনে কাজলির গায়ে চিমটি কাটে। সম্বিৎ ফিরে পায় কাজলি। গুছিয়ে নেয় তার শাড়ী। আধশোয়া ভঙ্গিতে ছিল উঠে বসে। ছুটে পালাতে চায়—পারে না। পিংলা তার শাড়ীর আঁচলের কোণ ধরে রেখেছে।

পিংলা আবার জঙ্গলকে নিয়ে পড়ে।—কি র‍্যা দাদা, তোর মনে রঙ ধরেছে না ?

জঙ্গলের মুখে তবুও কথা ফোটে না।

—কি গো সুন্দর পাহাড়ী, পিংলা সুর টেনে বলে, এক কলসি হাঁড়িয়াতে তোর নেশা হয় না, আর সুন্দরী কাজলি তোর মনে নেশা ধরিয়ে দিল্যা! সুন্দরী যাদু জানে, না ?

এবারে জঙ্গল কথা বলে।—চল পিংলা বাড়ি যাই।

—কেনে! পিংলা বিস্ময়ের স্বরে বলে, ঘরে যাবি কেনে! তোরা এখানে বস্যা রংয়ের টেক্কা তুরুপ মার, আমি বরং ঘরে যাই।

পিংলা ছুটে পালাতে চায়, পারে না। কাজলি তাকে ছুটে গিয়ে ধরে আনে।

জঙ্গল বলে, আমরা এক সঙ্গে যাবো পিংলা।

কাজলির কানের কাছে মুখ এনে পিংলা কি যেন বলে। কাজলি মাথায় তুলে নেয় শুকনো কাঠের বোঝা। তারপর পিংলা আর কাজলি দুজনে দ্রুত চলতে আরম্ভ করে বনের মধ্যে। মুহূর্তে বনের অন্ধকারে হারিয়ে যায় তারা। শুধু জঙ্গলের কানে আসে পিংলার উচ্ছ্বসিত হাসির ঝংকার।

অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে বনের মধ্যে। জঙ্গল সেই একই ভাবে বসে আছে। যেখানে বসেছিল। কাজলির ছড়িয়ে দেওয়া ফুলগুলো তেমনি ছড়িয়ে রয়েছে। নানাফুলের মেশানো গন্ধের সঙ্গে যেন কাজলির অঙ্গের মিষ্টি গন্ধ মিশে আছে।

কী এক ভাবনায় শিথিল হয়েছে জঙ্গলের দেহ-মন। বার বার চেষ্টা করছে মনের মধ্যে বাদাবনের দেশের ছবিটা আঁকতে, কিন্তু পারছে না।

কুয়াশা নেমেছে হেমন্তের বনে, সেই কুয়াশা তার মনেও। মনটা যেন ঢেকে দিয়েছে।

রাত হয়েছে। এক বিচিত্র নীরবতা বনের রাজ্য জুড়ে। শুধু এক-একটি রাতজাগা পাখীর ডাক কিংবা ডানা ঝাপটানোর শব্দ কানে আসছে। মাঝে মাঝে কানে আসছে কুকুরের ডাক। পাহাড়ী গাঁয়ে কুকুর ডাকছে।

ঘরে ফেরার কথা মনে আছে, কিন্তু ফেরার মন নেই। মাথার নীচে হাত দুটি ভাঁজ করে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

খোলা চোখের ওপরে আকাশ। যে আকাশে অজস্র নক্ষত্র জ্বলছে। কুয়াশার আড়ালে সে নক্ষত্রের অস্পষ্ট মুখ চোখে পড়ছে।

—দাদা, দাদা—জঙ্গলি দাদা।

পিংলার উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে আসে।

ইচ্ছে করেই সাড়া দেয় না জঙ্গল।

এদিকেই আসছে পিংলা। হাতে একটা লণ্ঠন। সঙ্গে আর একজন আছে।

এবারে চন্দরার ডাক শুনতে পায় জঙ্গল। পিংলার সঙ্গে চন্দরা আসছে।

জঙ্গল সাড়া দেয়। আগেভাগে ছুটে আসে পিংলা। বলে, তুই এখানে? আমরা তো খুঁজে খুঁজে হয়রান। রাত কত হইছ্যা জানিস! এখনো বনে বস্যা আছিস?

জঙ্গল বুঝতে পারে, তার যে কথা পিংলা জানে, সে কথা সে নিজের মনেই গোপন রেখেছে। অথচ জঙ্গল মনে ভেবেছিল, কাজলি আর তার কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ করে দেবে পিংলা।

চন্দরা কাছে এলো। লণ্ঠনের আলো পড়েছে মাটিতে ছড়িয়ে থাকা কাঁচের চুড়ির টুকরোর ওপর। চুড়ির টুকরো চোখে পড়তেই চন্দরার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠে। ওই রকম মোটা কাঁচের চুড়ি যে চন্দরাই কয়েকদিন আগে দিয়েছিল কাজলিকে।

কাঁচের চুড়ির টুকরো পিংলারও চোখে পড়েছে, সে-ও দেখেছে চন্দরার ভাবান্তর। দেখেছে চন্দরার চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠে নিবে গেছে।

কিন্তু জঙ্গল এসবের কিছুই জানে না।

অন্যদিন হলে নানাকথায় মুখর হতো জঙ্গল। আজ সে নীরবেই পিংলা আর চন্দরাকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে এলো।

॥ এগারো ॥

একবার ভেবেছিল জঙ্গল সেই ছোট টিলার দিকে যাবে। কিন্তু যাবে মনে করেও সেদিকে গেল না। চললো অন্যদিকে। যে দিকে বনের মধ্যে পোড়ো মন্দিরটা রয়েছে।

পিংলার সঙ্গে একদিন এই ভাঙা মন্দির দেখতে এসেছিল জঙ্গল। সেদিন শুনেছিল এই মন্দিরের কথা। পাহাড়ী গাঁয়ের মন্দির। মূর্তি ছিল না। ছিল একটি হাঁড়িকাঠ আর একটি খাঁড়া। লোকে বলতো, খড়্গ দেবীর মন্দির। প্রতিদিন বলিদান হতো, প্রতিদিন রক্ত দিতে হতো ওই খাঁড়া আর হাঁড়িকাঠে। এখানে নাকি নরবলিও হতো।

তবে এসব কথা অনেক দিনের পুরনো। এখনকার মানুষ সে সবের কিছুই চোখে দেখেনি। শুধু লোকমুখে ছড়িয়ে আছে সে সব কথা।

ভাঙা মন্দির দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে। সে হাঁড়িকাঠও নেই, খাঁড়াও নেই। শুধু একটা পাথর সিঁদুর মাখানো।

মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ায় জঙ্গল। চারদিকটা আগাছায় ভরা। একটা বটগাছ উঠেছে মন্দিরের গায়ে।

পোড়ো মন্দিরটার ভিতরে যায় জঙ্গল। কেমন যেন ভূতুড়ে এর ভেতরটা। এদিকওদিক ফিরে তাকায়। সিঁদুর মাখা পাথরটা পড়ে আছে। সাপের খোলস ছড়িয়ে রয়েছে পাথরটার ওপর।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে জঙ্গল। বনের মধ্য দিয়ে চলতে আরম্ভ করে নিজের খেয়ালে।

ডুলুং নদীটা বেড়ির মতো জড়িয়ে আছে এই বন-এলাকায়। চলতে চলতে ডুলুং-এর কিনারায় এসে দাঁড়ায় জঙ্গল।

নোনাগাঙের দেশের লোক জঙ্গল। সে গাঙ অথৈ জলের গাঙ। তবুও হাঁটু জলের নদী ডুলুংকে ভালো লাগে।

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে জঙ্গল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ফিকে অন্ধকার নামছে অরণ্যের দেশে।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলছিল জঙ্গল। কানে আসে টুকরো কথা। থমকে

দাঁড়ায় সে ! আড়াল থেকে লক্ষ্য করে কাজলি আর চন্দরা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে। কাজলির মাথায় শুকনো কাঠের বোঝা, আর চন্দরার হাতে তীর ধনুক। শিকারে গিয়েছিল চন্দরা। ব্যর্থ হয়ে ফিরছে।

চন্দরার সঙ্গে আগে কি কথা হয়েছে জানে না জঙ্গল, এখনকার কথাই তার কানে আসছে।

চন্দরা বলছে, আমি বুঝি কিছু জানি না ?

কাজলি বলছে, কি জানিস ?

চন্দরা বলছে, জঙ্গলের সাথে তুই মশকরা করিস নাই, ভাঙে নাই তোর কাঁচের চুড়ি। যে চুড়ি তোরে আমি কিন্যা দিইছি ?

কাজলি বলে, বল না আর কি বলবি। থামলি কেনে ?

চন্দরার গলার স্বর চড়ে ওঠে। —জঙ্গল তোর নতুন নাগর হইছ্যা, না ? ও তোর মনে রঙ ধরাইছ্যা, না ?

—ধর‍্যাইছ্যা তো কি হইছ্যা। ওকে আমি বিয়া করবো ?

—কি বললি ? চন্দরার গলার স্বর সপ্তমে চড়ে ওঠে। বলে, তোর মুখে আমি পাথর গুঁজে দিব।

—তুই কেমন মরদ জানি। ছুঁচো দেখে ভয় পাস – তুই অতো জোরে কথা বলিস না, হাসি লাগে।

বলে হেসে ওঠে কাজলি।

—কাজলি ! চন্দরা ধমকে ওঠে।

—শোন, একটা কথা তোকে বল্যা রাখি। তোকে আমার ভালো লাগে না রে। তুই কেনে আমারে ভালোবাসিস ? তুই যাই বলিস, আমি কোনদিন তোর হবো নাই।

—কাজলি।

—কেনে, টোনা কি করলে ? তাকে নিয়ে তো খেলতিস। আর টোনা তো তোকে ভালোবাসে। আমাকে তুই কাঁচের চুড়ি দিইছিলি, সে ভেঙে গেছে। টোনাকে দিইছিলি রূপোর বালা—সে তো ভাঙে নাই। যা—টোনার কাছে যা।

চন্দরা এগিয়ে আসে। কাজলির মুখোমুখি দাঁড়ায়। বলে, তোকে আমি ছাড়বো নাই।

—আহা মরে যাই আর কি। কাজলি পা বাড়াতে যাবে, চন্দরা টেনে ধরে তার শাড়ীর আঁচল। কাজলি শুকনো কাঠের বোঝা ছুঁড়ে দেয় চন্দরার

গায়ে। ফুঁসিয়ে ওঠে, —আমি তোর বাপকে গিয়ে বলবো, বলবো—এঁড়ে গরুটাকে গোয়ালে বেঁধে রাখো। হালের গরু, তার আবার মরদ হবার সাধ। ফুঃ—

এক ঝটকায় আঁচল টেনে নেয় কাজলি। শুকনো কাঠের বোঝা ফেলে রেখে ছুটে পালায় বনের মধ্যে।

চন্দরা অনুসরণ করে কাজলিকে। কিন্তু ধরতে পারে না। কাজলি বোধ হয় অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

জঙ্গল সেখানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে খানিকসময়। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে।

ঘরে ফিরলো জঙ্গল। যেন অন্য মানুষ। অন্য দিনের মতো বাড়ি ফিরেই পিংলার নাম ধরে ডাকলো না। কাকিকেও ডাকতে পারলো না। উঠোনে দড়ির খাটিয়ায় বসেছিল হিন্দোল। লক্ষ্য করলো জঙ্গলের ভাবান্তর।

—কি র‍্যা, কি হইছ্যা তোর? হিন্দোল বলে, শরীর খারাপ নয় তো?

—আমি ভালোই আছি কাকা। ছোট্ট কথায় জবাব দিলে জঙ্গল।

—ভালো আছিস তো অমন মনমরা কেনে? মায়ের কথা মনে পড়ছে বুঝি?

যদিও এই মুহূর্তে মায়ের কথা মনে পড়েনি জঙ্গলের—তবু বলে, হ্যাঁ। আমি চলে যাবো। অনেক দিন তো হলো।

—চল্যা যাবি কি রে! আর দুদিন বাদেই তো কালী পূজো—পাহাড়ী গাঁয়ের কালী পূজোর ধুমধাম দেখবি না—পূজোর সময় এন্তার আমোদ ফুর্তি হয়। মোরগের লড়াই, মহিষের লড়াই—তারপর নাচ-গান—এন্তার মজা চলে। তারপর আমরা শিকারে যাই—খরগোশ মারি, শূয়োর মারি, নেকড়ে মারি—তুই তীর চালাতে পারিস? বর্শা ছুঁড়তে পারিস?

—পারি, তবে তেমন অভ্যেস নেই।

—এখনো তো দু-তিন দিন হাতে আছে, তালিম নে—ঠিক হয়ে যাবে। ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি শিকারে যাবে না, সে কি হয়? তোকেও বনে যেতে হবে। উধারে দীঘলপাহাড়ীর বন আছে, বুনো শূয়োর খরগোশ ছাড়া হামেশা নেকড়ে দেখা যায়—ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি একটা বুনো শূয়োর তো মারবে বটে।

জঙ্গল বলে, মাকে একা ছেড়ে এইছি, তারপর এ্যাদ্দিন তো থাকার কথা

ছিল না, তাই ভাবছি আমি কালী পুজোর পরদিন চলে যাবো। পরে এক সময় মাকে নিয়ে আসবো।

—দাঁড়া পিংলাকে ডাকি। হিন্দোল চীৎকার করে ডাকে, পিংলা—পিংলা রে।

ডাক শুনে পিংলা ছুটে আসে। বলে, ডাকো কেনে—কি হইছ্যা?

হিন্দোল বলে, কি আবার হবে। তোর জঙ্গল দাদার মন কেমন করছ্যা মা'র জন্যে। বলছ্যা, চলে যাবে কালী পুজোর পর দিনে।

—যেত্যে দিল্যা তো। পিংলা বলে, কচি খোকা—মন কেমন করছ্যা। ওকে বেঁধে রাখবো। বোনের ফোঁটা না নিয়ে ও কোথায় যাবেক?

—শুনলি তো? হিন্দোল বলে, তোকে ফোঁটা দেবে বল্যা আতা বেচে তোর জন্যে ধুতি এনেছে পিংলা। বলেছে নিজের হাতে পিঠা বানিয়ে তোকে খাওয়াবে। আর তুই কিন্যা চল্যা যাবি বলিস। যাওয়া হবেক নাই। পিংলা তোকে ফোঁটা দিবে, তারপর যাবি। আর তোর কাকি কি বলে জানিস? বলে এখানে এই গাঁয়ে তোর বিয়া দিবে।

পিংলা খিল খিল করে হাসে।

জঙ্গল যেন একটু লজ্জা পেয়েছে।

হিন্দোল বলে, আমি যাবো সুন্দরবনে—তোর মাকে নিয়ে আসবো। বলবো, ইখানে ঘর আছে, এ তো আপনঘর—ইখানে থাকো। কি রে জঙ্গল, ঠিক কথা কিনা?

জঙ্গল নিরুত্তর।

হিন্দোল বলে, ও দেশে যা আছে বেচে কিনে চল্যা আয়। গিধ্‌নির বাজারে একটা দোকান দে—ইখানে এসে থাক। পাহাড়ীগাঁয়ের মানুষ তোকে মাথায় তুলে রাখবে। কি, কথা বল র‍্যা?

জঙ্গল বলে, কাকা আজ আমার মন ভালো নেই, ওসব কথা থাক।

—আরে মন ভালো নাই তো হাঁড়িয়া খা। হিন্দোল বলে, না হয় পিংলার কাছে মহুল আছে, তাই খা। দেখবি আঁধার মনে হাজার বাতি জল্যা উঠবে। অ পিংলা, যা তোর দাদাকে আজ মহুল খাইয়ে দে।

পিংলা মুখ টিপে হাসে। জঙ্গলের কাছে এগিয়ে আসে। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, কি র‍্যা, আজ বুঝি কাজলির সঙ্গে দেখা হয় নাই?

—কই র‍্যা। হিন্দোল বলে, যা পিংলা, মহুল নিয়ে আয়। আমিও একটু চেখে দেখি।

পিংলা ঘরের মধ্যে যায়। উঠোনে পাতা দড়ির খাটিয়ায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে জঙ্গল।

মহুলের বোতল বার করে আনে পিংলা। জঙ্গলকে দেখিয়ে বলে, কিরে খাবি ?

—না রে পিংলা, আজ কিছু ভালো লাগছে না। ওটা কাকাকে দিগে।

—তুই খাবি তো খা, নয়তো কাউকে দিব নাই। একটু গলা ভিজিয়ে নে না।

—না। আমি এখন ঘুমোবো।

—ঘুমোব কি র‍্যা ! মেঘাই-এর ঘরে যেতে হবে না ? আজ তো সেখানে ভোজ আছে।

—আজ আর কোথাও যাবো না পিংলা।

-তা কি হয় নাকি। না গেলে কি চল্যা নাকি ? পিংলা মাথা হেঁট করে চুপি স্বরে বলে, যাবি না কেনে ! কাজলিও যাবে। কাজলির হাত ধরে তুই নাচবি না ?

মহুয়ার বোতলটা জঙ্গলের চোখের সামনে দোলাতে আরম্ভ করে পিংলা। আর কেউ শুনতে না পায়, তাই জঙ্গলের কানের কাছে মুখ রেখে বলে, মহুয়ায় মনটা রঙিন করে নে দাদা, দেখবি মেজাজটাই বদলে গেছে।

—না। জঙ্গলের এক কথা।

এতক্ষণে পিংলার মনে হয়, নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটনা ঘটেছে যার জন্যে জঙ্গলের এই ভাবান্তর।

তার মনে পড়ে কাঁচের চুড়ির টুকরোর কথা। পিংলার বুকটা কেমন দুলে ওঠে। চন্দরাকে সে জানে। মুখে যাই বলুক, জঙ্গলকে সে প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারে না।

—রাগ করিস না পিংলা। জঙ্গল মুঠোয় টেনে নেয় পিংলার একটা হাত। বলে, সত্যি আমার মন ভালো নেই রে।

মেঘাই পাহাড়ীর বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। পাহাড়ী গাঁয়ের প্রান্তে। জঙ্গল বলেছিল যাবো না, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে যেতেই হলো। মেঘাই পাহাড়ীর নাতি ডাকতে এসেছিল।

পিংলাকে নিয়ে জঙ্গল যখন মেঘাই পাহাড়ীর বাড়ি পৌঁছলো তখন খানিক রাত হয়ে গেছে।

গ্যাসের আলো জ্বলছে উঠোনে। বেশ কিছু লোকও জড়ো হয়েছে। তার মধ্যে চন্দরা আর কাজলিও রয়েছে।

জঙ্গল আসতেই চন্দরা একবার তাকালো কাজলির দিকে। কাজলির চোখ তখন জঙ্গলের দিকে।

মেঘাই উঠে আসে। জঙ্গলের হাত ধরে বসায় দড়ির খাটিয়ায়। বলে, তুই ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বটে। সে-ও এমনি করে এসে দাঁড়াতো। আমরা তখন ছোট, দেখতাম সেই দশাসই মানুষটাকে। তোকে দেখ্যে মনে হয়, সেই মানুষটি ফিরা আইছ্যা।

জঙ্গলের আজ সব কিছুই বিস্বাদ মনে হয়। তার সুন্দর মনটা আজ একটা ভয়ঙ্কর পাথরের নীচে চাপা পড়েছে।

জঙ্গল, পিংলা এসেছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে একটি কথাও বললে না চন্দরা। বরং সে বারবার বাঁকা চোখে দেখছে জঙ্গলকে।

উঠোনের মাঝখানে এক কলসি হাঁড়িয়া আর এনামেলের গ্লাস। প্রথমেই গ্লাস ভরে মেঘাই দিলে জঙ্গলকে। পানীয়টুকু পান করলো জঙ্গল।

তারপর আরম্ভ হলো হাঁড়িয়া পানের পালা। মেঘাই-এর বৌ একধামা মুড়ি আর পেঁয়াজ পোড়া এনে রাখলো। ওগুলো হলো চাট। হাঁড়িয়া আর মুঠো মুঠো আলু পেঁয়াজ—দেখতে দেখতে পাত্র শূন্য হয়ে গেল।

জমা হওয়া মানুষগুলো নেশায় চুর। এবার আরম্ভ হবে নাচ। বুড়ো চুঙ্গি পাহাড়ী, পেটের নাড়িভুঁড়ি পচে গেছে, হাঁড়িয়া সহ্য করতে পারে না। অথচ গিলেছে আকণ্ঠ। হড়হড় করে খানিকটা বমি করলো।

নাচ আরম্ভ হবার মুখেই বিপত্তি। মেঘাই-এর বৌ এসে খানিকটা শুকনো ছাই ছড়িয়ে দিলে বমির ওপর।

এবারে আরম্ভ হলো নাচ। বুড়ো চুঙ্গি পাহাড়ী, ধুঁকছে—তারও নাচার শখ। ধরতে গেল ষোল বছরের ছুঁড়ির হাত। ছুঁড়ি সরে গেল। চুঙ্গি নেশার ঝোঁকে উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে।

মেঘাই জড়িত কণ্ঠে বলে, বুড়োটারে সরিয়ে দেরে।

কজন ছোকরা চুঙ্গিকে চ্যাংদোলা করে উঠোনের বাইরে গোবরগাদার পাশে দিয়ে এলো। এখন গোবরগাদায় গড়াগড়ি দিক অনাহুত বুড়ো খচ্চর চুঙ্গি পাহাড়ী।

এদিকে নেশায় বুঁদ মানুষগুলো নাচ শুরু করেছে। নাচের আসরে কাজলির

হাত ধরতে গেল চন্দরা, ছিটকে সরে গেল কাজলি। এতো লোকের সামনে ঘৃণা মিশিয়ে বললে, তোর সঙ্গে নাচবো নাই।

চন্দরার রক্তচক্ষু কাজলির ওপর। কাজলি পরোয়া করে না ওই রক্ত চক্ষু। সে এক হাতে পিংলার হাত ধরে অন্য হাতে ধরলো মেঘাইএর ছেলে রঘুর হাত। আর চন্দরা দশের মাঝে অপমানিত হয়ে বললে, আমি নাচবো নাই।

—নাচবি নাতো বস্যা বস্যা হাঁড়িয়া খা—পেঁয়াজ পোড়া খা, কাজলি জড়িত কণ্ঠে বলে, রাগ করিছিস আমার ওপর, তা নাচবি না কেনে?

হাঁড়িয়া নেই। শূন্য কলসিটা উপুড় করে দিলে চন্দরা।

মেঘাই আরো এক কলসি হাঁড়িয়া এনে রাখলো উঠোনে। চন্দরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো কলসির ওপর।

পিংলা বললে, অতো খাস নাই র‍্যা। বেসামাল হয়ে যাবি।

কে কার কথা শোনে। যতক্ষণ পেটে ধরে, বসে বসে হাঁড়িয়া গিলতে লাগলো চন্দরা।

নেশায় কতকটা বেসামাল অবস্থা চন্দরার। উঠে দাঁড়াতে পারছে না। টোনা নাচছিল। চন্দরাকে ভালোবাসে টোনা। কিন্তু চন্দরা দেয়নি সে ভালোবাসার দাম। টোনাকে ছেড়ে সে কাজলির পিছনে ছুটেছে। সবই জানে টোনা। কিন্তু চন্দরাকে সে ভুলতে পারেনি। এখনো মনটা তার চন্দরার ওপর।

এতদিন মনে মনে কাজলিকে ঈর্ষা করেছে টোনা। ভেবেছে কাজলিই তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চন্দরাকে। আজ তার সে ভুল কিছুটা ভেঙেছে. সে বুঝতে পেরেছে, চন্দরার লোভ পড়েছে কাজলির ডগমগ যৌবনের ওপর। কিন্তু তারই বা যৌবন কম কিসে।

টোনা এগিয়ে যায়। চন্দরার হাত ধরে তোলে। জড়িত কণ্ঠে বলে, নাচবি না কেনে—আয়।

কিন্তু চন্দরার উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। উঠতে গিয়েই বমি করে ফেলে। লুটিয়ে পড়ে উঠোনের ধুলোর উপর।

জঙ্গল দুহাতে আড়কোলা করে চন্দরাকে তুলে খাটিয়ার ওপর শুইয়ে দেয়। যেন বেহুঁশ হয়ে পড়েছে চন্দরা।

নাচের আসর তেমন জমলো না। সব যেন কেমন বেসুরো হয়ে গেছে

জঙ্গলও স্থির বসে আছে। মেঘাই বারবার জিজ্ঞাসা করে- জঙ্গলের শরীরটরির খারাপ হয়েছে কি না। কিন্তু জঙ্গলের এক কথা, তার মন ভালো নেই।

এক সময় মেঘাই-এর বৌ এসে ডাক দিয়ে গেল। খাবার দেয়া হবে, পাত পাতা হয়ে গেছে।

মানুষগুলোর পেট যেন চুঁই চুঁই করছিল। খাওয়ার নামেই যে যার উঠে পড়ে।

এলাহীকাণ্ড করেছে মেঘাই। দশ রকম পদ রান্না হয়েছে। তিন রকমের মাছ, দু'রকমের মাংস তারপর আরো পাঁচ রকম তরকারি। এছাড়া শেষ পাতে পায়েসের ব্যবস্থা।

চন্দরার নেশার ঘোর এখনো কাটেনি। খেতে বসেও মুখ থুবড়ে পড়ছে। যত না খাচ্ছে তার চেয়ে হাতে মুখে গায়ে মাখছে বেশী। চন্দরা না হয় জব্বর নেশা করেছে, কিন্তু এত মানুষের মধ্যে জঙ্গল ছাড়া কেউই ঠিক সুস্থ মাথায় নেই। পিংলার লজ্জা সরম আছে, তবু সে শাড়ীর আঁচল ঠিক রাখতে পারছে না। টোনা তো লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছে। বারবার ঢলে পড়ছে চন্দরার গায়ের ওপর। কিন্তু চন্দরার চোখ দুটো কাজলির ওপরই পড়ছে।

কাজলির চোখ দুটোও জবাফুলের মতো লাল। সে-ও নেশার আমেজে ঢুলছে। কিন্তু বেসামাল নয়।

কিন্তু জঙ্গল স্থির। তার মধ্যে অস্বাভাবিকতার কোন লক্ষণ নেই।

আজ যেন সব কিছুতেই অরুচি জঙ্গলের। যে এতো খেতে ভালবাসে, সে আজ খেতেই পারছে না।

মেঘাই বলে, এই যে জঙ্গল—খা। তোর ঠাকুদা একটা গোটা পাঠা সাবড়ে দিত। তুই তার নাতি—খেতে পারছিস কই র‍্যা ?

জঙ্গল কথা বলে না। একবার শুধু ফিরে চায় মেঘাই পাহাড়ীর দিকে।

ভোজপর্ব প্রায় শেষ হয়ে এলো। পায়েস পরিবেশন করছে মেঘাই-এর বৌ।

জঙ্গলের পাত দেখিয়ে মেঘাই বলে, এই পাতে দাও বেশী করে।

মেঘাই-এর বৌ প্রায় এক গামলা পায়েস রাখে জঙ্গলের সামনে। মনে হয় এখনি গামলা উপুড় করে দেবে পাতে। জঙ্গল দুটো হাত পাতের ওপর নাড়তে থাকে। মেঘাই চোখ ইশারা বৌকে কিছু বলে। মেঘাই-এর বৌ আচমকা গামলা রেখে দেয় জঙ্গলের পাতের ওপর।

জঙ্গল কি বলবে ভেবে পায় না।

মেঘাই বলে, ফেলে রাখলে হবে না। সব খেতে হবে।

জঙ্গল এবারে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে। একবার তাকায় পায়েসের গামলার দিকে। মহিষের দুধের পায়েস। ভুরভুর করছে গন্ধ। আর মাছ মাংসের চেয়ে মিষ্টি তার প্রিয়। শেষটা পায়েসের গামলায় হাত দেয় জঙ্গল।

গামলা চেঁচেমুছে পরিষ্কার করলো জঙ্গল। ঘটি থেকে আলগোছে খানিকটা জল পান করলো। তাকালো মেঘাই-এর মুখের দিকে। যেন বলতে চাইছে আরো দাও, আরো খাবো।

মেঘাই ডাক দেয় বৌকে। বৌ এসে দাঁড়ায়। মেঘাই বলে, আরো খানিকটা পায়েস দাও।

জঙ্গল বলে, না—আর খাবো না।

মেঘাই বলে, কেন কি হলো? ঈশ্বর পাহাড়ীর নাম রাখবি তো।

জঙ্গলের মাথায় হঠাৎ জিদ চেপে যায়। বলে, দাও—পায়েস দাও।

মেঘাই-এর বৌ আবার মেটে গামলায় পায়েস এনে ঢেলে দেয়। জঙ্গল 'না' বলে না।

সবাই দেখছে জঙ্গলের পায়েস খাওয়া। এবারেও পাত্র পরিষ্কার করে একঢোক জল পান করলো। তারপর হাত গুটিয়ে উবু হয়ে বসলো।

মেঘাই বলে উঠলো, সাবাস—ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বটে। মরদের নাতি মরদ—

হাভাতে চুঙ্গি পাহাড়ী সারা গায়ে গোবর মেখে টলতে টলতে এসে দাঁড়ায়। ধুঁকছে মানুষটা। এসেই একটা এঁটো পাতা টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

জড়িত কণ্ঠে বলে, আমারে কিছু দিবেক নাই। ও মেঘাই দাও কিছু।

যে যার উঠে পড়ে। মেঘাই তার বৌকে ডেকে বলে চুঙ্গিকে কিছু দিতে। মেঘাই-এর বৌ মাংস ভাত এনে দিতে চুঙ্গি হুমড়ে পড়ে পাতের ওপর।

মানুষ নয়, একটা ভয়ঙ্কর প্রেতের মতো মনে হয় চুঙ্গিকে। মাংস চিবোতে পারে না। দাঁত নেই—তবু গবগব করে গিলছে। ওর মরা পেটে এখন রাক্ষসের ক্ষুধা।

জঙ্গল চেয়ে থাকে মানুষটার দিকে। ঘৃণা নয়, চুঙ্গিকে দেখে কেমন করুণা হয় তার। মনটাও ভিজে ওঠে।

পিংলা অনুচ্চকণ্ঠে ডাকে, দাদা—

জঙ্গল ফিরে তাকায়। ঘরের কানাচে আলো আঁধারিতে কাজলি আর পিংলা দাঁড়িয়ে আছে।

হাতছানি দিয়ে ডাকছে পিংলা।

॥ বারো ॥

কি যেন হয়েছে জঙ্গলের। ঘরের বাইরে যেতে চায় না। দু দুটো দিন বাড়ি বসেই কাটালো। শুধু বিকেলের দিকে খানিকসময় তুলুংএর পারে গিয়ে এসছে।

গতকাল গিধনির হাটে গিয়েছিল পিংলা। তাকে অনেক করে বলেছিল যাওয়ার জন্যে, কিন্তু জঙ্গলকে নড়াতে পারেনি। বলেছিল জঙ্গল—আমার বেড়ানো, দেখা সব হয়ে গেছে। শুধু তোর কৌটা নেওয়ার জন্যে বসে আছি।

দুটো দিন একরকম বসে বসে কাটিয়েছে জঙ্গল।

কালীপুজোর দিন সকাল থেকে পাহাড়ীপাড়া সরগরম হয়ে উঠলো। পুজো হবে বাগুলীর ঠাঁই। পাড়ার ছেলে-ছোকরারা সব চলে গেছে প্রতিমা আনতে। বলিদানের পাঁঠা তো জোগাড় করাই আছে। বলির জন্য একটা মহিষও এসেছে।

পাহাড়ী সমাজে পূজোর নিয়মটাও ভালো। পূজোর আগের দিন যে যা রোজগার করবে, সে সেই অঙ্কটাই তুলে দেবে গাঁয়ের মোড়লের হাতে। তা সে এক টাকাই করুক, আর দশ টাকা কি তারও বেশী রোজগার করুক। যে যা পাবে এনে দেবে মোড়লের কাছে। পূজোর ব্যাপারে মিথ্যে কথা কেউ বলে না। কালীর নামে ভয় ভক্তি দুই যে আছে।

গাঁয়ের মোড়ল এখন হিন্দোল। ঈশ্বর পাহাড়ীর পর তার ভাই ভীম মোড়ল হয়েছিল। তারপর ভীমের ব্যাটা হিন্দোল।

মোড়ল বলে কথা। সবাই 'মান্যি' করে। বিয়ে হোক, শ্রাদ্ধ শান্তি হোক, নালিশ আপোষ হোক, মোড়লকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না।

সমাজের মানুষ যেমন মোড়লকে 'মান্যি' করে, তেমনি মোড়লকেও দায়িত্ব বুঝে হিসেব করে চলতে হয়।

এ গাঁয়ে ঘর-পঞ্চাশেক মানুষের বাস—ভালোমন্দ সবই আছে। তাদের

সঙ্গে মানিয়েগুছিয়ে চলতে হয়। এক চোখামি চলবে না। যা কিছু সালিশ বিচার সব করতে হবে মাথা ঠাণ্ডা করে। মোড়লের ইজ্জৎ তার নিজের কাছে।

এতো করেও অনেকসময় ফ্যাশাদে পড়তে হয় মোড়লকে। বিশেষ করে সালিশ বিচারের সময়ে। দু' পক্ষের তো মন রাখা যায় না সব সময়।

মোড়ল, ওঝা আর পুরুত—এদেশের সমাজে এই তিন মাথা। এদের বাদ দিয়ে কোনো কিছু হয় না। সবার ওপরে আবার পুরুত।

রীতিমত ধুমধাম লেগে গেছে পূজোর দিন সকাল থেকে। আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই।

বনের মধ্যে বাশুলীর ঠাঁই—বারো মাস প্রায় আগাছার জঙ্গলে ভরা থাকে। এখন সাফ করা হয়ে গেছে। বড় একটা চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। বুড়ো ফণিমনসা গাছের সামনে বাঁধানো বেদী, তার ওপর টিনের চাল তুলে দেওয়া হয়েছে। ওইখানে পূজো হবে। বাইরে সিঁদুর মাখানো দুটি হাঁড়িকাঠ। একটিতে ছাগল অন্যটিতে মহিষ বলি হয়।

একটু বাদেই কালী প্রতিমা এসে যাবে। জায়গাটা আরো জমজমাট হয়ে উঠবে। এখন তো ছেলে-ছোকরার ভিড়—আর একটু বেলা হলেই বয়স্করাও আসতে আরম্ভ করবে।

দুপুরের পর থেকে ছোটখাটো বাজারও বসবে। বেসাতি নিয়ে আসবে দূরের—কাছের ব্যাপারীরা। পসরা সাজিয়ে বসবে। খাবারের দোকান, মণিহারী কিংবা আলতা সিঁদুর খেলনার পসরাও। আরো অনেকরকম টুকিটাকি জিনিস আছে। সব-মিলিয়ে ছোট খাটো মেলা বসে যায়। এ মেলায় নানা জিনিসের পসরা নিয়ে আসে সাঁওতাল গাঁয়ের মানুষ, দুরন্ত লোধারা, গিধনি আর বেলপাহাড়ীর পাহাড়ীরা। গাঁয়ের লোক তো এখানে আসেই, ভিন্ন গাঁয়ের লোকও আসে, আসে অনেক অনেক বাবু মানুষ। পাহাড়ীদের পূজোর নাম ডাক আছে।

পূজোর দিন দুপুরে এখানে সমাজের সভা বসে যায়। ছেলে-মেয়ে বুড়ো—সবাই আসতে পারে। এ যে সমাজের সভা। শুকনো খড় পাতা বিছিয়ে দেওয়া হয়, তারই উপর বসে যায় সব। পুরুত, ওঝা, মোড়লের আসন আলাদা। তাদের জন্য তিনটে চৌকি রাখা হয় কালীর বেদীর সামনে। পুরুতের চৌকির ওপর একটা আসন পাতা থাকে।

সমাজের ভালোমন্দ কথা নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে। খোলা মন নিয়ে যার যা ইচ্ছে তা বলতে পারে। এ সভা মেলামেশার সভা। পূজোর দিনে সালিশ বিচার নালিশ এসব চলে না।

ছেলেরা বাঁশের দোলনা করে প্রতিমা নিয়ে এলো। সাড়ে চার হাত প্রতিমা। যে যেখানে ছিল হৈ-চৈ করে ছুটে এলো বাগুলীর ঠাঁই। বেদীতে আলপনা দিতে এলো বুড়ি স্থুড়ি গোছের তিন চার জন। বেদীতে বসানোর আগে এয়োরা মূর্তিকে ঘিরে ঘুরে ঘুরে বরণ করলো। শাঁখ বাজলো, উলুধ্বনি দিল—বাজনদারেরা বাজালো কাড়া-নাকড়া-মাদল-কাঁসি।

চিলকিগড়ের বনদেশ মুখর হলো।

বাজনা বেজে উঠতে আরো মানুষ এসে জড় হলো। ছোট বয়সের ছেলে মেয়েরা তো রীতিমত ভিড় জমিয়ে তুললো।

সবাই যাচ্ছে বাগুলীর ঠাঁই। কিন্তু জঙ্গল যেতে চায় না। হিন্দোল ডেকে গেছে—যায়নি। কাকিমা যাবার সময় ডাক দিয়ে গেছে, তবুও জঙ্গল খাটিয়া ছেড়ে ওঠেনি।

শেষটা এলো পিংলা। নাছোড়বান্দা সে। জঙ্গল যত বলে, তোরা যা পিংলা, আমি সন্ধ্যেবেলা যাবো—পিংলা তবু বলে, তুই না গেলে আমিও যাবো নাই।

শেষ পর্যন্ত জঙ্গল উঠলো। পিংলা তাকে এমনি ছাড়েনি, যাবার আগে রীতিমত মানানসই করে কাপড়-জামা পরিয়ে নিয়েছে।

জঙ্গল এসে দাঁড়াতেই ভিড় করা মানুষের অনেকেই তার দিকে ফিরে তাকালো। যারা ভিন গাঁয়ের মানুষ, যারা চেনে না জানে না জঙ্গলকে, তারা তো দশাসই চেহারার জোয়ানকে দেখে অবাকই হলো।

জঙ্গলের কিন্তু কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। একান্তে একটি পাথরখণ্ডের ওপর বসে পড়লো।

—ও কে বটে র‍্যা? ভয়ংকর চেহারার পুরোহিত বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞাসা করে।

—ও জঙ্গল পাহাড়ী, ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে এক জন বলে ওঠে।

—ওকে ডাক। পুরোহিত বলে, ওর মধ্যে একটা মরদকে দেখি বটে। ওর কপাল দেখ্যা মনে হয়, ও রাজা বটে।

সবাই কেমন যেন তাজ্জব বনে যায়। জঙ্গলকে ডেকে আনে ক'জন ছোকরা। পুরোহিতের সামনে এসে দাঁড়ায় জঙ্গল।

শ্মশানচারী পুরোহিত, নাম ডম্বরু, থাকে জামবুনির ওদিকে জঙ্গলে। তাও সব সময় এক জায়গায় থাকে না। ঘুরে বেড়ায় শ্মশানেমশানে। ভূত প্রেত দৈত্য দানব নিয়ে ওর কারবার। এন্তার মদ গাঁজা খায়, সব সময়ে নেশায় চুর হয়ে আছে। চোখ দুটো সব সময় জবাফুলের মত লাল। যেন ফেটে পড়বে গোল চোখ দুটো। যত সব অখাদ্য তাই ওর খাদ্য। জ্যান্ত মুরগী চিবিয়ে খায়, ঢোঁড়া সাপগুলো আগুনে পুড়িয়ে নেয়, চিতার আগুনে ঝলসানো মড়ার মাংস খেতেও অনেকে দেখেছে। এ তল্লাটে লোকে বলে, ডম্বরু ঠাকুর নাকি পিশাচ সিদ্ধ।

এসবের কিছুই জানে না জঙ্গল। মানুষটাকে সে আজই প্রথম দেখছে। মানুষটা মানুষ নয়—অমানুষ। জঙ্গলের চোখে একটা আস্ত শয়তান। প্রথম দেখাতেই ডম্বরুর ওপর জঙ্গলের মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে।

ডম্বরুর পাশের চৌকিতে আরো একজন মানুষ। যে লোকটা শিয়ালমুখো। তার পাশেই বসে আছে জঙ্গলের কাকা হিন্দোল।

হিন্দোল বলে, এ্যাই জঙ্গল—ঠাকুরের পায়ের ধুলো নে।

জঙ্গল মাথা নীচু করতে ডম্বরু তার হাত ধরে ফেলে। বলে, তুই তো বট-গাছ—তুই তো রাজা, তুই মাথা নীচু করবি কেনে?

অস্বস্তি বোধ করে জঙ্গল। মানুষটার মুখের দিকে তাকাতেই তার গা-পিত্তি জ্বলে যায়।

ডম্বরু একবার হিন্দোলের মুখের দিকে চায়। তারপর জঙ্গলের একটা হাত আপন মুঠোয় নিয়ে বলে, এ আজ মাহুষ বলি দিবেক।

উপস্থিত সকলে একবার ডম্বরু পুরুতের মুখের দিকে চায়। আর হিন্দোলের মুখের রঙটা কেমন বদলে যায়। ডম্বরু পুরুত না শেষটা বলে বসে, জঙ্গল পাহাড়ী তো রাজা, ও হবেক পাহাড়ীদের মোড়ল।

কিন্তু না—ডম্বরু সে কথা বললো না। বললে, তুই যা জঙ্গল—রাতে তোকে নিয়ে আমার কাজ আছে।

জঙ্গল বাশুলীর ঠাঁই ছেড়ে চলে এলো একটু তফাতে। নির্জনে এসে বসলো। চিন্তাশূন্য মন! চুপচাপ বসে থেকে শুনতে লাগলো দেখা-অদেখা পাখির ডাক। শুনতে শুনতে এক সময় গাছের নীচে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো সে। কখন যেন ঘুমে তার দু'চোখ বন্ধ হলো।

—সুন্দর র‍্যা, সুন্দর।

যেন স্বপ্নের মধ্যে কোনো মিষ্টি কণ্ঠের ডাক শুনছে জঙ্গল।

না। স্বপ্ন নয়। সত্যি। কাজলি এসে বসেছে মাথার কাছে।

—কাজলি!

—হ্যাঁ, দেখছিস না?

—তুই এখানে কেন?

—তোর জন্যে।

কাজলি হাত রাখে জঙ্গলের মাথার ঘন চুলে। ঘন চুল মুঠোয় নিয়ে বলে, চল—উধারে যাই। ওই বনে—উধারে কেউ যায় না।

—না।

—কেনে?

—আমার মন ভালো নেই।

—বল্ না, কি হইছ্যা তোর মনে?

—আমিই জানি না আমার মনে কি হয়েছে।

হেসে ওঠে কাজলি। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গ ওঠে। কিন্তু জঙ্গল আজ দেখেও দেখে না। সত্যিই আজ তার মন ভালো নেই।

—ওঠ্ না।

—না।

—দেখবি!

কাজলি দু'হাত দিয়ে টেনে তোলে জঙ্গলের ভারী শরীরটা। তারপর জঙ্গলের মনটাকে চাঙ্গা করতে সে তার চোখে চোখ রাখে। বলে, আমার চোখে চোখ রাখ, দেখবি মন তোর তাজা হয়ে গেছে।

জঙ্গল চোখ রাখে কাজলির চোখে। সুন্দর দুটি কালো চোখের তারায় তারই ছায়া।

—চল উধারে যাই। কাজলির নিঃশ্বাসের ছোঁয়া জঙ্গলের মুখে।

এবারে উঠে দাঁড়ায় জঙ্গল। বলে, কোথায় যাবি, চল।

জঙ্গলকে নিয়ে কাজলি এলো নিবিড় বনের মধ্যে। বন এখানে এতো নিবিড় সূর্যের আলোও ঠিকমতো এসে পৌছয় না। যদিও সূর্য এখনো আকাশে, তবু বনের এ নিভৃত পরিবেশে অন্ধকার জড়ানো।

ছোট একটি গাছ। গাছটার সর্বাঙ্গে লতা জড়িয়ে আছে। লতায় ধরেছে গোছাগোছা ফুল। মিষ্টি গন্ধ সে ফুলের।

পাশেই ঘাসে ঢাকা জায়গা। মাথার ওপরে একটি ঝাঁকড়া মহুয়া গাছের চাঁদোয়া।

জঙ্গল আর কাজলি মুখোমুখি বসলো। কারো মুখে কথা নেই। অথচ অনেক কথা কাজলির চোখে-মুখে। জঙ্গল যে কথা বুঝেও বুঝছে না। সে বসে আছে একটা পাথরের মূর্তির মতো।

কাজলি শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপর। একটি হাত রাখলো জঙ্গলের কোলে। একটি হাতে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিলে শাড়ীর আবরণ।

আগুন লাগলো জঙ্গলের রক্তে। দুরন্ত সে আগুন। শেষবারের মতো সে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কামনার ভয়ংকর আগুন যে দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

—সুন্দর। কাজলির বুকটা ওঠা-নামা করছে। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। যে হাতখানি ছিল জঙ্গলের কোলের ওপর, সে হাতখানি আপন বুকের ওপর আশ্রয় নিলে।

আচমকা সোঁ করে একটা আওয়াজ উঠলো। জঙ্গল আর কাজলি দুজনের চকিত দৃষ্টি একই সঙ্গে লক্ষ্য করলো, একটা তীর এসে বিঁধেছে মহুয়া গাছের গুঁড়িতে।

কাজলি ভয় পেয়ে জঙ্গলের বুকে আশ্রয় নিলে। সে তখন ঠকঠক করে কাঁপছে।

—ভয় নেই রে, আমি তো আছি।

জঙ্গল উঠে দাঁড়িয়ে তীর তুলে নেয়।

কাজলি দু'হাতে ভেঙে ফেললো সে তীর।

জঙ্গল বলে, ভয় নেই—ও তীর আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে।

কাজলি বলে, আমি জানি—এ নিশানা কার বটে?

জঙ্গল চারপাশে লক্ষ্য করে। কাউকে চোখে পড়ে না। বলে, তুই চলে যা কাজলি।

—তুই যাবি না?

—না। পরে যাবো।

কাজলি তাকালো জঙ্গলের মুখের দিকে। কিন্তু তার দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আঁচলে চোখ মুছেও জলের পথ বন্ধ করতে পারলো না।

সন্ধ্যা থেকেই বাশুলির ঠাঁই জম-জমাট হয়ে উঠলো। হ্যাজাক আর গ্যাসের আলোয় জায়গাটা আলোকিত। পাহাড়ী পাড়ার সবাই এসেছে। এসেছে লোধা পাড়া, সাঁওতাল পাড়ারও অনেক মানুষ। ডুলুং-এর ওপার থেকে বাবুরাও।

বাশুলীর ঠাঁই জুড়ে মেলা বসেছে। রকমারি জিনিসের পসরা নিয়ে এসেছে অনেকে। লাড্ডু, মেঠাই, পাঁপড় ভাজা, কাঠি গজা থেকে আরম্ভ আলতা-সিঁন্দুর, কাঁচের চুড়ি, পিতলের গয়না, চুল বাঁধার ফিতে—কোনো কিছুই বাদ যায়নি।

এদিকে মেলা জমেছে, ওদিকে জমেছে রসের খেলা। হাঁড়িয়া চলছে, চলছে নাচ গান, চলছে বাজি-বাজনা, চলছে জুয়া খেলা—সব মিলিয়ে একেবারে রমরমা ব্যাপার।

ডম্বরু এক সময় খোঁজ করলো জঙ্গলের। পূজোয় বসার আগে। কিন্তু এখানে জঙ্গল নেই। আশেপাশে খুঁজেও তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

রাতের প্রথম প্রহর শেষ।

পূজোয় বসবে ডম্বরু। এক সঙ্গে কাডা-নাকাড়া, ঝাঁঝ-ঘন্টা বেজে উঠল। ডম্বরু পিশাচসিদ্ধ—হাঁড়িয়া আর মহুল গিলেছে আকণ্ঠ। গাঁজাও টেনেছে। পানের সঙ্গে খেয়েছে একদলা আফিম আর কাঁচা সিদ্ধি।

একবার রক্তচক্ষু মেলে তাকালো ডম্বরু। তারপর বাজখাঁই গলায় 'জয় তারা—জয় মা কালী করালবদনী'—বলে আসনে বসলো ডম্বরু। বেজে উঠলো কাড়া-নাকড়া-মাদল। একসঙ্গে বিশপঁচিশটা শাঁখ বাজালো পাহাড়ী ঘরের বৌ-ঝিরা।

পূজোয় বসলো ডম্বরু। ওঝা রইলো বেদীর পাশে।

ডম্বরুর পরনে রক্তবর্ণের ধুতি, অঙ্গে 'জয় তারা' নামাবলি, গলায় হাড়ের মালা। হাতে রুদ্রাক্ষের বালা, আর কপালে বিরাট একটা সিঁদুরের টিপ।

পূজো করছে ডম্বরু। পূজো যেমন তেমন মাঝে মাঝে 'জয় তারা' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠছে।

অমাবস্যার নিকষকালো অন্ধকারে পাহাড়ী গাঁয়ের বনের মধ্যে বাশুলীর ঠাঁই পিশাচসিদ্ধ ডম্বরু পূজো করছে। আর এক সঙ্গে জড়ো হওয়া মানুষগুলো সে পূজো দেখছে।

রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ।

এবার বলিদানের পালা। ওঝা মার্কণ্ডের হাতে সিঁদুর মাখানো খাঁড়া তুলে দিলে ডম্বরু। শিয়ালমুখো মার্কণ্ড খাঁড়া হাতে হাঁড়িকাঠের কাছে এলো।

বাজনদারেরা শুরু করলে বলির বাজনা। পাঁঠাগুলোকে এক এক করে নিয়ে আসা হলো। ডম্বরু 'জয় তারা' বলে পাঁঠার গায়ে জলের ছিটে দিলে।

এক-এক করে পাঁচটা পাঁঠা বলি দিলে মার্কণ্ড। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। খানিকটা রক্ত ধরে রাখলো একটা পাত্রে। আর পাঁচটি রক্তাক্ত মাথা প্রতিমার সামনে রাখা হলো। প্রতিটির মাথায় একটি করে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে ডম্বরু।

এবারে মহিষ বলির পালা। শিশু মহিষ বাঁধা আছে একান্তে। তার দৃষ্টিতে ভয়। কিন্তু সে কি বুঝেছে তার অন্তিম মুহূর্ত এগিয়ে এসেছে!

ডম্বরু একবার চারিদিকে তাকালো। সে যেন কোনো একজনকে খুঁজছে। যে এখানে নেই।

—জয় তারা, আমার কথা সে কানে নিলে নাই। বলে ডম্বরু বিরাট খাঁড়াটা হাতে তুলে নিলে।

মহিষটাকে যথারীতি মন্ত্রপূত করা হলো। আট দশজন জোয়ান মহিষটাকে নিয়ে এলো হাঁড়িকাঠের কাছে। হাঁড়িকাঠে কি তার গলা ঢোকানো যায়। কজন জোয়ান মরদ মহিষটাকে বাগে আনতে দারুণ বেগ পেল।

ডম্বরু নিজের হাতে বলি দেবে মহিষ। জয় তারা বলে হুঙ্কার ছাড়লো।

ভয়ংকর নর-পিশাচের মত মনে হয় ডম্বরুকে। খাঁড়া শূন্যে তুললো সে। 'জয় তারা' বলে খাঁড়ার আঘাত করলে মহিষের গলায়। মুণ্ডটা ছিটকে পড়লো। রক্ত ছুটলো ফিনকি দিয়ে। সে রক্ত দু হাতে নিয়ে খানিকটা গায়ে মাখলো ডম্বরু।

কাটা মুণ্ড নিয়ে ডম্বরু চললো বেদীর দিকে। মহিষের ধড়টা তখনো কাঁপছে। তখনো তার পা নড়ছে। কাড়া নাকড়া-মাদল বাজছিল—থেমে গেল।

বাশুলীর ঠাঁই হঠাৎ যেন নেমে এলো শ্মশানের নীরবতা।

কিছুক্ষণ বাদেই আবার মুখর হলো বাশুলীর ঠাঁই। বাজনা বাজলো। শুরু হলো আরতি।

আরতির মধ্যে ডম্বরু এক একবার 'জয় তারা' 'জয় তারা' বলে হুঙ্কার ছাড়ছে।

রাত তখন শেষ হয়ে আসছে।

জঙ্গল এসে দাঁড়ালো বাশুলীর ঠাই।

পূজো শেষ। ডম্বরু পুরুত থেকে আরম্ভ করে আরো মানুষ মহুয়া আর হাঁড়িয়ার নেশায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। কাজলিও নেশায় বুঁদ হয়ে ধুলোমাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। চন্দরা নেশার ঝোঁকে টোনাকে জড়িয়ে ধরেছে। বেদীর দিকে যেতে চেনা অচেনা আরো অনেককে দেখতে পায় জঙ্গল। বলির জায়গায় চাপচাপ রক্ত, তাও দেখলো জঙ্গল। দেখলো বেদীর পাশে মহিষের রক্তমাখা ধড়টা জড়িয়ে ডম্বরু বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে।

জঙ্গল একবার তাকালো কালী মায়ের মূর্তির দিকে। তারপর কি মনে হলো ফিরে চললো বাড়ির পথে।

জঙ্গলের পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিল পিংলা। জঙ্গল এসে দাঁড়াতেই তাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে পিংলা। —কোথায় ছিলি তুই?

—বনে।

—কেনে তুই গেলি না পূজোর ঠাঁই।

—ভালো লাগে না পিংলা।

—কেনে?

—বলতি পারবো না। তবে আমার মন ওখানে থাকতি চায় নি। আমার ভালো লাগলো না। কিন্তু তুই কাঁদছিস কেন?

—সে তোকে বোঝাতে পারবো নাই। পিংলা বলে, তোর কি হইছ্যা বলতো?

—কিছুই হয়নি রে। আর ভালো লাগছে না কিছু। চলেই যেতাম, শুধু তোর ফোঁটা নেবার জন্যে আছি।

জঙ্গলের বুকে মুখ গুঁজে পিংলা নতুন করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলে, ফোঁটা তোকে নিতে হবে না র‍্যা। তুই আজই চল্যা যা।

—তোর হাত থেকে ফোঁটা না নিয়ে আমি কোথাও যাবো না। তুই-তো আমাকে আটকে রাখলি। তবে আজ আবার একথা বলছিস কেন?

—সে তুই বুঝবি না। পিংলা চোখ রাখে জঙ্গলের চোখে। বলে, আমার ভয় করছে দাদা।

জঙ্গল হাসে। বলে, পিংলা—তোর হাতের ফোঁটা না নিয়ে আমি যাবো না। আমাকে কেউ কখনো ফোঁটা দেয়নি।

পিংলা এদিকওদিক তাকায়। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বলে, একটা কথা দে

দাদা, দুদিন তুই কুথাও যাবি না। চন্দরা যদি তোকে শিকারে নিয়ে যেতে চায় তাও যাবি না। আমার কাছে কাছে থাকবি দুদিন। তোকে এ দুদিন আমি কুথাও যেতে দিব নাই।

জঙ্গল বলে, পিংলা তোর ভয় নেই। তোর ফোঁটা আমি নেবই।

পিংলা বলে, কথা দে—চন্দরার সঙ্গে তুই শিকারে যাবি না।

জঙ্গল বলে, কেন! চন্দরা যেমন তোর দাদা; আমার ভাই সে।

পিংলা চাপা চীৎকার করে ওঠে—না, না—তুই ওর সঙ্গে যেতে পারবি না।

পিংলার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় জঙ্গল। তাকে শান্ত করতে চায়। বলে, পিংলারে—তোর মনে ভয় কেন আমারে খুলে বলবি।

এদিকওদিক তাকায় পিংলা। তারপর সে বলতে থাকে তার ভয়ের কথা। কাল রাতে হাঁড়িয়া খেয়ে চন্দরা নেশার ঝোঁকে পিংলাকে বলে, জঙ্গলকে সে খতম করবে। আর ওই ডম্বরু পুরুতটাও নাকি জঙ্গলের ওপর চটে গেছে। চন্দরা বলেছে, ডম্বরু পুরুত রাতে জঙ্গলকে আসতে বলেছিল। কিন্তু আসে নি। মহিষ বলি দেবার কথা ছিল জঙ্গলের। সে কথাও শোনেনি। ডম্বরু পুরুত রাতি নাকি চন্দরাকে বলেছে, তার কথা ভূত, প্রেত, পিশাচ শোনে, জঙ্গল মানুষের বাচ্চা হয়েও তার কথা শোনেনি।

আচমকা জঙ্গল উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। শেষরাতের নীরবতা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। চীৎকার করে ঘোষণা করে, ভয় নেই পিংলা, আমার নাম জঙ্গল পাহাড়ী।

হিন্দোল পাহাড়ীর রাগী কুকুরটা ভয়ংকর শব্দে ডেকে ওঠে।

জঙ্গল নিজের নামটা আরো একবার উচ্চারণ করে।

এই মুহূর্তে জঙ্গলকে দেখে কেমন যেন ভয় হয় পিংলার। ঈশ্বর পাহাড়ীর ওপর দুরন্ত অভিশাপের কথা সে বাবার কাছ থেকে শুনেছে। শুনেছে ঈশ্বর পাহাড়ীর জীবনটা কি করে শেষ হয়েছিল। তারপর একথাও জানে, জঙ্গলের বাবাও যায় বাঘের পেটে। এর পরের কথাটা ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে পিংলার।

আশ্চর্য মানুষের মন। সে কথা পিংলার মনে, জঙ্গলও সেই কথাগুলো ভাবছে। ভাবছে বলেই তার পেশীগুলো আরো শক্ত হয়ে উঠছে, গরম হয়ে উঠছে তার রক্ত। কোনদিন যা বিশ্বাস করেনি জঙ্গল, আজও করে না। বরং এই তো সুযোগ এসেছে, যে অভিশাপ তাদের বংশের ওপর এসেছিল.

সেই অভিশাপের বোঝাটা এই শাল-মহুয়ার দেশে ডুলুং-এর জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাবে সে।

॥ তেরো ॥

শাল মহুয়ার অরণ্যের দেশ চিলকিগড়ের পাহাড়ী গাঁয়ে ভোর হচ্ছে। বনের পাখিরা ডাকছে। ডানা মেলছে আকাশে। আরম্ভ হচ্ছে ওদের দিন।

অরণ্যের ওধারে পূবের আকাশ। যেখানে সূর্য উঠছে।

শিশিরভেজা সবুজ বনে পড়লো ভোরের আলো। ঝলমল করে উঠলো বনভূমি।

উঠোনে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে জঙ্গল। অলসচোখে ফিরে তাকালো সামনে বনের পটভূমিকায়।

যখন এদেশে প্রথম এসেছিল জঙ্গল, তখন তার দুচোখে ছিল দেখার নেশা। আজ সে নেশা ফুরিয়ে গেছে। সব কিছুই তার চোখের সামনে, অথচ কোনো কিছুই তার মনে দাগ কাটে না।

দুচোখ বন্ধ করলো জঙ্গল। বন্ধ দুচোখের মধ্যে দুরন্ত রায়মঙ্গলের ছবিটা স্পষ্ট। রায়মঙ্গলের পাশে সেই মায়া জড়ানো বাদা-বন, তাও যেন বন্ধ চোখের মধ্যে।

চোখ বন্ধ করে সেই ছবি দেখতে দেখতে কখন যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে জঙ্গল।

গভীর ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন উঁকি দিয়ে যায়। সে স্বপ্নের মধ্যেও রায়মঙ্গলের ছবিটা স্পষ্ট।

ঘুম ভেঙে গেল জঙ্গলের। ধড়মড় করে উঠে বসলো। সুন্দর স্বপ্নটা শেষ হয়েছে দুঃস্বপ্নের মধ্যে। মায়ের কান্না শুনতে পেয়েছে জঙ্গল। তাদের সেই ছোট কুটিরের দাওয়ায় বসে মা যেন জঙ্গলের নাম ধরে ডাকছে আর কাঁদছে।

—মা—মাগো।

স্পষ্ট রৌদ্রে ঝলমল করছে চারদিক। জঙ্গল দুহাতে চোখ রগড়ে আড়মোড়া ভেঙে দেহটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে নেয়। না—দেহটা মজবুতই আছে। মনটাও।

পিংলা তার মায়ের সঙ্গে বসে আছে দাওয়ায়। চন্দরাও এসেছে। উঠোনের কোণে বসে তীর-ধনুক ঠিক করছে। শিকারে যাবে সে।

পাহাড়ীরা আজ শিকারে যাবে। যেতে হয়। এটা ওদের নিয়ম। তীর, বর্শা, যাই হোক—আজ ওদের রক্তের পিপাসা মেটাতে হয়। কিছু না হোক—নিজের রক্তও দিতে হবে। নইলে সারা বছর খারাপ যাবে। জীবনে, সংসারে, সমাজে অমঙ্গল হবে। সুতরাং রক্ত আজ চাই-ই।

যারা শিকারে অশক্ত, যারা বয়সের ভারে স্থবির গেছে - তারা তাদের অস্ত্রে কালী পূজোর বলিদানের রক্ত মাখাবে।

তীর ধনুক ঠিক করলে চন্দরা। এবার তালিম নেবার পালা।

বাড়ির সামনে অদূরেই একটা কলাঝাড়। চন্দরা নিজেই কলাগাছের গায়ে একটা গোল চিহ্ন এঁকে দিয়ে এলো কাঁচা হলুদ দিয়ে।

এবারে সে দেখবে হাতের নিশানা ঠিক আছে কি না।

ধনুকে তীর যোজনা করে তাক করলো চন্দরা। বার পাঁচেক চেষ্টা করেও ঠিক লক্ষ্যে তীর বেঁধাতে পারলো না।

জঙ্গল বসে বসে সবই দেখছে। গাদা বন্দুকে অভ্যস্ত জঙ্গল এক সময় সর্দার পাড়ার সাঁওতালদের সঙ্গে মিশে তীর চালাতে শিখেছিল। সাঁওতালরাও অবাক হতো তার হাতের নিশানা দেখে।

এখনো কি সে নিশানা আছে হাতে? তীর ধনুকের সঙ্গে ক'বছর তো কোনো সম্পর্কই নেই। তবু তার ইচ্ছে হয়, একবার চন্দরার কাছ থেকে তীর ধনুক নিয়ে দেখে, নিশানা ঠিক আছে কি না।

চন্দরা তখনো তীরের নিশানা করছে।

এবারে চন্দরার তীর নির্দিষ্ট নিশানার ধারে কাছেই গেল না। দূরে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো তার তীর।

পিংলা শব্দ করেই হেসে উঠলো। বললে, ওগুলো ফেলে দে চন্দরা।

চন্দরা কটমটিয়ে তাকায় পিংলার দিকে।

কি মনে হয় জঙ্গলের, আস্তে আস্তে উঠে যায় চন্দরার কাছে। বলে, দে তো আমারে—দেখি পারি কি না।

চন্দরা বলে, নিবি নে—তবে এ তোর কাজ নয়।

জঙ্গল তুলে নেয় ধনুক। একটি ভারী তীর তুলে নিয়ে যোজনা করে ছিলায়। এক চোখ বন্ধ করে নিশানা করে। দুরন্ত গতিতে তীর কলাগাছের নির্দিষ্ট বিন্দুতে বিঁধে থরথর করে কাঁপে।

দাওয়া থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে এসে পিংলা জড়িয়ে ধরে জঙ্গলকে। চন্দরার মুখটা যদিও ম্লান হয়ে যায়, তবু মুখে বলে—সাবাস। জঙ্গল ফিরে তাকায় তার কাকিমার মুখের দিকে। ভেবেছিল, কাকিমা হয়তো খুশি হবে না ; কিন্তু তা নয়, কাকিমার মুখখানাও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আগেই কথা ছিল চন্দরার সঙ্গে শিকারে যাবে জঙ্গল। সেই কথাই ঠিক আছে।

চন্দরা একটা পুরনো ধনুক, আর কয়েকটা পাখি মারার হাল্কা তীর এনে জঙ্গলকে দিলে।

পিংলা বললে, ও তীর ধনুক কি হবে র‍্যা। এ্যাই চন্দরা- ও তীরে তো চড়াই পাখি মারে। দাঁড়া- জঙ্গল দাদাকে আমি ভালো তীর ধনুক এনে দিচ্ছি।

চন্দরার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

আর দাঁড়ায় না পিংলা, সোজা ছুটতে আরম্ভ করে।

পিংলা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায় অর্জুনের বাড়ির উঠোনে। পিংলার ভালোবাসার মানুষ অর্জুন পাহাড়ী। অর্জুনের মত পাকা তীরন্দাজ এ তল্লাটে নেই। গত বছর সাঁওতাল গাঁয়ে তীর ছোঁড়ার পাল্লায় অর্জুনই সবাইকে হারিয়ে দিয়ে বাহবা কুড়িয়েছিল। পুরস্কার পেয়েছিল রূপোয় বাঁধানো তীর-ধনুক, আর একটা বেতের ঢাল।

—কি র‍্যা পিংলা ?

—তোর কাছে এলাম র‍্যা। আমায় ভালো দেখে একটা ধনুক আর দশটা তীর দিবি ?

—কেনে, তুই শিকারে যাবি ?

—জঙ্গল দাদা যাবে। উয়ার তো তীর-ধনুক নাই।

- নিয়া যা, তোর যেটা পছন্দ।

—না, তুই দিয়া দে। তীর-ধনুকের আমি কি জানি।

—দিচ্ছি। বোস—

পিংলা বসে অর্জুনের পাশটিতে।

অর্জুন বলে, তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন! কি হইচ্ছ্যা তোর। চন্দরা কিছু বলেছে র‍্যা?

পিংলা কোনো কথাই গোপন করে না। অর্জুনকে সে বিশ্বাস করে। অমন সুন্দর মনের মানুষ এ গাঁয়ে নেই। তার মনটা যেমন সুন্দর, তেমনি বড়ো। মনের সঙ্গে তার দেহটাও মজবুত। সাহসও আছে বুক জোড়া।

অর্জুন তার নিজের প্রিয় ধনুকটি এবং বাছাবাছা পঁচিশটি তীর দেয় পিংলাকে। বলে, এতে নেকড়ে খতম হবে। নিয়া যা।

তীর-ধনুক নিয়ে পিংলা চলে যাচ্ছিল। পিছু ডাকে অর্জুন। বলে, উয়ারা কোনদিকে যাবে বলে যাস। যেন ভুলিস না।

পিংলা ফিরে তাকায় অর্জুনের মুখের দিকে।

অর্জুন বলে, আমি যাবো। দেখবো কি করে উয়ারা। চন্দরার শয়তানী আমি ভাঙবো। আর শোন—তুইও যাবি তো আসবি, কাজলিকে ডেকে নিবি।

পিংলার মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাব বুক ভরে যায় অর্জুনের কথায়।

—যা ঘরে যা।

পিংলা যেমন ছুটতে ছুটতে এসেছিল, তেমনি চলে যায় বনের পথ ধরে। বুকটা যেন তার অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে।

ঘরে ফিরেই জঙ্গলের হাতে তুলে দেয় তীর ধনুক।

জঙ্গল হাতে তুলে নেয় ধনুক। তীরগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে। চন্দরা কটমটিয়ে তাকায় পিংলার দিকে।

যেন কিছুই বোঝেনি পিংলা! জিজ্ঞাসা করে, কোন জঙ্গলে যাবি রা চন্দরা?

চন্দরা বলে, দীঘলপাহাড়ী হয়ে চাকুলিয়ার দিকে যাবো। উধারে বুনো শূয়োর মেলে।

—আমায় নিয়া যাবি? পিংলা একটু এগিয়ে চন্দরার কাছে দাঁড়ায়। বলে, আমি কোনদিন শিকার করা দেখি নাই। নিয়া যাবি? তোকে আমি মহুল খাওয়াবো।

—না। চন্দরা বলে, তুই না মেয়েছেলে। শিকারে যাবি কি? তুই বরং ঘরে বসে পিঠা বানা।

—ঠিক আছে, তুই যা—যদি না বরা মারতে পারিস, তাহলে তোকে মরদ বলবো নাই। বলে পিংলা ছুটে পালায়।

খিড়কির পথ ধরে পিংলা সোজা চলে যায় অর্জুনের বাড়ির দিকে। চন্দরা কোন জঙ্গলে যাবে খবরটা দিয়ে আসতে।

যে কথাটা আগে জানেনি, জানার কথাও নয়—শিকারে যাবার আগে সেই কথাটাই জানলো জঙ্গল।

হিন্দোল পাহাড়ীর দুই বিয়ে। বড় বৌ-এর ছেলেপিলে হয়নি বলে আবার বিয়ে করেছিল হিন্দোল। ছোট বৌ-এর ছেলে চন্দরা। চন্দরার যখন তিন বছর বয়েস তখন পিংলা জন্মালো বড় বৌ-এর গর্ভে। জন্ম থেকেই চন্দরার হিংসে পিংলার ওপর। এতো বড় হয়েছে, কিন্তু হিংসেটা যায়নি।

ছোট বৌও নাকি হিংসে করতো বড় বৌকে। যখন তখন আঁটকুড়ি মাগী বলে গালাগালি করতো। আর বড় বৌ-এর মেয়ে হতে সে তো জলে পুড়ে মরতে লাগলো। পাহাড়ী সমাজে মেয়ের দাম বেশি।

হিন্দোল কিন্তু দুই বৌকে সমান ভালোবাসতো। কিন্তু ছোট বৌ দারুণ যন্ত্রণা দিতো বড় বৌকে। এমনকি পিংলাকে মেরে ফেলার মতলবও ছিল তার মনে।

হিন্দোল দুই বৌকে যতই ভালোবাসুক—ছোট বৌ-এর কথাতেই তাকে উঠতে বসতে হতো। বড়বৌ শেষ পর্যন্ত মেয়েকে নিয়ে চলে যায় চাকুলিয়ায় তার বাপের বাড়ি।

চার বছর মেয়েকে নিয়ে সেখানে ছিল পিংলার মা। ছোট বৌ মরে গেল সাপের কামড়ে। তারপর হিন্দোল গেল শ্বশুরবাড়ি। বড় বৌ মেয়েকে নিয়ে এলো নিজের বাড়ি।

চন্দরা তখন বছর পাঁচেকের শিশু। চন্দরা প্রথম থেকেই পিংলার মাকে সহ্য করতে পারেনি। পিংলাকেও না। এখন বড় হয়েছে, ওপর ওপর ভালো ব্যবহারই করে, কিন্তু মন তার এখনো বিরূপ।

কিন্তু পিংলার মা, চন্দরাকে মনে প্রাণে ভালোবাসতে চেয়েছে। আজও চায়।

না-বলা কথা বলতে পিংলার চোখে জল ঝরে পড়ে। বলে, চন্দরাকে আমি ভালোবাসি র‍্যা। কিন্তু ওর ভালোবাসা পাই নাই। মনে বড় দুখ লাগে জঙ্গল দাদা।

—দুঃখ করিস নে। জঙ্গল বলে, দুঃখের দরজায় সুখ উঁকি দেয়।

চোখের জল মোছে পিংলা। বলে, আমার সঙ্গে উদিকে চল দাদা!

—কোথায়?

—আয় না।

জঙ্গলকে নিয়ে গোয়াল ঘরের পাশে এলো পিংলা। ইঁদুরে মাটি তুলেছে, সেই মাটির টিপ পরিয়ে দিলে জঙ্গলের কপালে। বললে, তোর ভয় নাই। আমার মন বলছ্যা, কেউ তোর কিছু করত্যা পারবে না?

জঙ্গল হাসিমুখে বললে, পিংলা—তোর জন্যে আজ আমার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে। মরণে আমার ভয় নেই, কিন্তু আমি মরব না রে?

—ও কথা বলিস কেনে! পিংলার তুচোখে জল টলমল করে। বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ে মাটিতে।

জঙ্গলের তু-চোখও সজল হয়ে ওঠে। পিংলার চিবুক স্পর্শ করে তু'হাতে। বলে, পিংলারে—তোর ফোঁটা আমি নেবো। কিন্তু তুই একটু হাসবি না? তোর হাসিমুখ দেখবো না শিকারে যাবার আগে।

পিংলা আঁচলে চোখের জল মোছে। যদিও মনের ওপর তার তুঃসহ চিন্তা, তবু সে মুখে হাসি ফোটায়।

জঙ্গল বলে, তুই ভাবিস নারে! আমার মনের একটা ইচ্ছের কথা তোকে বলি—তোকে আমি আমার দেশে নিয়ে যাবো।

—নিয়্যা যাবি তোর দেশে! পিংলা বলে, অর্জুনকে নিয়া তোর দেশে যাবো।

জঙ্গল কি যেন ভাবে। একটু চুপ করে থেকে বলে, তুই আমার বোন, চন্দরা আমার ভাই। আমরা সবাই থাকবো পিংলা। চল—

শিকারের আয়োজন সম্পূর্ণ। এখন রওনা হলেই হলো। সাজগোছ সারা হয়ে গেছে জঙ্গলের। পিংলাই তাকে সাজিয়ে দিয়েছে। নিজের আলপাকার লাল শাড়ীটি তু'পায়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে পরিয়ে দিয়েছে। যাত্রাদলের রাজারা যেমন পরে। কোমরে বেঁধে দিয়েছে হালকা গামছা। খালি গা। মাথার বাবরি চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে লাল ফিতে বেঁধে দিয়েছে, তার ওপর পাখির পালক গুঁজে দেওয়া।

জঙ্গল দাঁড়ালো উঠোনে। কাঁধে তার তীর ধনুক, হাতে বর্শা। রোদ লেগে বর্শার ইস্পাতের ফলাটা চকচক করছে।

হিন্দোল অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল। একসময় বলে ওঠে, ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি বটে!

জঙ্গল এগিয়ে এলো। বর্শা আর তীর ধনুক নামিয়ে রেখে কাকা

কাকিমার পায়ের ধুলো মাথায় নিলে! তারপর আবার দাঁড়ালো উঠোনের মাঝে।

এই মুহূর্তে সেই ভয়ংকর অভিশাপের কথাটা মনে এলো। মনে হলো কারা যেন বলছে, যাসনে জঙ্গল -ভয়ানক বিপদ তোর সামনে।

মনটা হঠাৎ কেমন দুর্বল হয়ে যায়। মনে পড়ে মায়ের কথা।

তারপরই নিজের দেহটাকে ঝাঁকুনি দেয়। দেহটাকে শক্ত করে। ইস্পাতের মতন তার পেশী, কঠোর সাহসী তার মন। সেই দেহ মন আর এই হাতিয়ার থাকতে কিসের অভিশাপ।

জঙ্গলের দুচোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। তার মধ্যেকার দুর্মদ মনটার ঘুম ভেঙে যায়। মনে মনে স্মরণ করে ঈশ্বর পাহাড়ী আর দুর্জয় পাহাড়ীকে। তার রক্তে তো তাদেরই রক্তধারা।

জঙ্গল পাহাড়ী দাঁড়িয়ে আছে উঠোনের মাঝখানে। পিংলা অবাক চোখে দেখছে। শান্ত মানুষটা কেমন যেন ভয়ংকর উঠেছে।

শিকারে যাবার আগে যেতে হবে বাশুলীর ঠাঁই। কালী মাকে প্রণাম করতে হবে। পরতে হবে বলিদানের রক্তের তিলক। তারপর পুরোহিতের আশীর্বাদ নিয়ে যেতে হবে জঙ্গলে।

যে যেখানেই যাক, সূর্য ডোবার আগে ফিরে আসতে হবে বাশুলীর ঠাঁই। যে শিকার করতে পারবে ভালো, নয়তো নিজের রক্ত দিতে হবে অস্ত্রে, দিতে হবে মায়ের বেদীতে।

পাহাড়ী গাঁয়ের শিকারীরা জমায়েত হয়েছে বাশুলীর ঠাঁই। মাদল বাজছে। গম গম করছে পরিবেশ। মেয়েরাও অনেকে এসেছে। ভিড়ের মধ্যে কাজলি আর পিংলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জঙ্গল এসে দাঁড়ালো কালী মায়ের বেদীর সামনে। যেখানে দুটি আসন পেতে বসে আছে ডম্বরু আর শিয়ালমুখো ওঝা মার্কণ্ড। ডম্বরুর চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। সে তার গোল গোল ভয়ংকর দুটো চোখ দিয়ে দেখছে জঙ্গলকে।

জঙ্গল এখন অন্য মানুষ। একবার কালী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দুচোখ বন্ধ করলো। তারপর চোখ রাখলো ডম্বরুর চোখে।

না ডম্বরু, না জঙ্গল—কারো চোখে পলক পড়ে না। দুজন দুজনকে দেখছে।

শেষ পর্যন্ত হার মানলো ডম্বরু। তার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। আর জঙ্গল তখনো দেখছে ডম্বরুকে।

ডম্বরুর মুখটা বিকৃত হলো। মুখে কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার মুখের রেখা আর চোখের ভাষা দেখেই বোঝা যায়, মানুষটার মধ্যে একটা দুষ্ট শয়তান ভর করে আছে।

সবাই প্রণাম করলো ডম্বরুকে, মার্কণ্ড ওঝাকে। জঙ্গল কিন্তু মাথা নোয়ালো না। আশীর্বাদ চাইলো না। কালী মায়ের বেদীর সামনে থেকে সরে এসে দাঁড়ালো একান্তে। দেখলো পিংলাকে, দেখলো কাজলিকে। তার মনটা ভরে গেল এক মুহূর্তে।

ডম্বরু পুরুত আর মার্কণ্ড ওঝার আশীর্বাদ নিয়ে এলো চন্দরা। জঙ্গলের পাশে দাঁড়ালো। জঙ্গলের পাশে নিতান্ত বেমানান মনে হয় তাকে।

—চল, চন্দরা বলে, আর দেরী নয় রে।

নিঃশব্দে চন্দরাকে অনুসরণ করে জঙ্গল। একবার পিছন ফিরে তাকায় না।

বাশুলীর ঠাঁই ছেড়ে দুই ভাই বনের পথে অদৃশ্য হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে আকণ্ঠ মহুল গিলেছে চন্দরা, কিন্তু জঙ্গল কাকিমার দেওয়া ক্ষীর দুধ ছাড়া কিছুই খায়নি।

চন্দরা চলেছে আগে। তাকে অনুসরণ করছে জঙ্গল।

মাদলের আওয়াজটা তখনো এদের কানে আসছে।

॥ চোদ্দ ॥

সূর্য মাঝ আকাশে জ্বলছে।

দীঘলপাহাড়ীর গভীর অরণ্য পেরিয়ে জঙ্গল আর চন্দরা এসে দাঁড়ালো একটি টিলার ওপর।

এ পথে জঙ্গল কোনোদিন আসেনি। তাই তার চোখে এদিকের দৃশ্যপট নতুন।

টিলার ওপরটা ফাঁকা। শুধু কয়েকটা পিয়াশাল গাছ ইতস্তত গজিয়ে উঠেছে।

জঙ্গল ফিরে তাকায় চারদিকে। সব কিছুই সুন্দর তার চোখে। বিশেষ করে ধলভূমগড়ের ওধারে পাহাড়ের হাতছানি তাকে সব ভুলিয়ে দেয়।

—আমরা কোনদিকে যাবো রে চন্দরা?

চন্দরা আঙুলের নিশানায় দেখিয়ে দেয় পশ্চিম দিকের বনভূমি।

টিলার ওপর খানিক দাঁড়িয়ে আবার চলতে আরম্ভ করে ওরা।

যত এগিয়ে চলেছে বন ততো নিবিড় হচ্ছে। আলো ছায়া জড়ানো বনপথ। এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে। মাঝে মাঝে ছোট খাটো টিলা। জায়গায় জায়গায় জলচলার নালা পথ। এক একটা নালা দিয়ে সংকীর্ণ জলধারা বয়ে চলেছে।

তেষ্টা পেয়েছে জঙ্গলের। নালার পরিস্কার জল আঁজলা ভরে পান করে। তারপর আবার চলতে আরম্ভ করে।

এতটা পথ এসেছে, বুনোশূয়োর দূরের কথা, একটি খরগোশ কিংবা গোসাপ চোখে পড়েনি।

আরো কিছু দূরে এসে একটা চওড়া নালা-পথের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় জঙ্গল। তরতর করে স্বচ্ছ জল বয়ে চলেছে পাথরের টুকরোর মধ্যে দিয়ে। নালার এপারে ওপারে ঘন ঝোপ চোখে পড়ে। জঙ্গল যদিও এদেশের বনের কথা জানেনা, তবু সুন্দরবন মুল্লুকের মানুষ সে—বন-জঙ্গলের চরিত্র সে বোঝে।

এই রকম জলার ধারে জন্তু-জানোয়ারেরা সব সময়ে না থাকলেও আসে।

জঙ্গলের সন্ধানী দৃষ্টি তাই নালার এপার ওপারের ঝোপের দিকে।

কিছু বলবে বলে চন্দরার দিকে ফিরে তাকালো জঙ্গল। ফিরে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের মনটা কেমন দুলে উঠলো। কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠেছে চন্দরার চোখ দুটি।

তবু জঙ্গল সহজ সুরেই বললে, তুই এখানে দাঁড়া, আমি ওধারে যাচ্ছি। না হয় তুই যা, আমি এখানে থাকি। আমার মন বলছে এখানে কিছু পাওয়া যাবে।

—তুই যা। চন্দরা বলে, আমি ইধারে আছি।

তীর-ধনুক বাগিয়ে নিলে জঙ্গল। কোমরের গামছার বাঁধনের ভিতরে বর্শাটা গুঁজে দিলে। ঘাড়ের ওপর উঁচু হয়ে রইলো বর্শার ফলা। ওপারে যাবে বলে নীচের দিকে নামতে লাগলো জঙ্গল। কিন্তু সোজা পথে নয়, আঁকাবাঁকা ভাবে দ্রুত চলতে লাগলো সে।

নালা পেরিয়ে একবার পিছন দিকে ফিরে তাকায় জঙ্গল। দেখে চন্দরা তীর নামিয়ে রাখছে।

জঙ্গল মনে মনে হাসলো। তারপর কিছুটা কাত ভাবে এগিয়ে চললো। চন্দরার ওপর নজরটা তার ঠিকই আছে। আরো একটু এগিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে এসেই লক্ষ্য করলো ওপারে। চন্দরাকে দেখতে পেল না জঙ্গল।

ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে সন্তর্পণে এগিয়ে যায় জঙ্গল। তারপর একটা ঝাঁকড়া গাছে চেপে বসলো। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এদিকওদিক তাকালো জঙ্গল। চন্দরাকে দেখতে পেল না।

অদূরেই নীচে একটা ঝোপ নড়ে উঠলো। বুনো শূয়োর। একটা নয়, দুটি।

জঙ্গল দুটি ডালের ফাঁকে পাছা দিয়ে নীচে আর এক ডালে দুটি পা দিয়ে জুৎসই করে বসলো। পিঠের কাছে একটা ডাল—সেটিতে ঠেস দিলে। তারপর বর্শাটা ডালে কায়দা করে রেখে ধনুকে তীর যোজনা করলে।

অব্যর্থ নিশানা জঙ্গলের। দুরন্ত তীর গিয়ে বিঁধলো শূয়োরের পিঠে। ঝোপের মধ্যে ঢুকে ঝোপ তোলপাড় করতে লাগলো আহত শূয়োর। আর একটি শূয়োর ছুটে পালালো।

গাছ থেকে নেমে পড়লো জঙ্গল। তূণীরে রাখলো তীর, ধনুক রাখলো কাঁধে—বর্শা বাগিয়ে ধরে এগোতে লাগলো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

আহত শূয়োর দাঁত উঁচু করে তেড়ে আসছে। জঙ্গলের রক্তে এখন রক্তের নেশা। বর্শা দিয়ে আঘাত করলে শূয়োরের পেটে। শূয়োরটা গোঁত্তা খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো।

বর্শা বিঁধিয়ে জঙ্গল দারুণ উত্তেজনায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভয়ংকর বাজখাঁই কণ্ঠের বিকৃত হাসি ভেসে আসে জঙ্গলের কানে।

চকিতে ফিরে তাকায় জঙ্গল। পিশাচ-সিদ্ধ ডম্বরু দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার বল্লম। আর তার পাশে ধনুকে তীর যোজনা করছে চন্দরা।

দারুণ বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়েও হিসেবে ভুল করে না জঙ্গল। যা কিছু ঘটে যাবে এখনি, একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা নয়। বিশ তিরিশ হাত ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা—

চন্দরার একটি তীরের জন্যে অপেক্ষা করে জঙ্গল।

যে মুহূর্তে তীর নিক্ষেপ করবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই বিচিত্র ভঙ্গিতে এক দিকে কাত হয়ে সরে গেল জঙ্গল। তীরটা আছড়ে পড়ে মাটিতে। আর সেই অবসরেই, প্রতিপক্ষ যা ভাবতে পারেনি, তাই করে জঙ্গল। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডম্বরুর ওপর। ছিনিয়ে নেয় ডম্বরুর হাতের বর্শা।

ডম্বরুর বুকে বর্শার ইস্পাতের ফলা রেখে জঙ্গল আক্রোশে ফেটে পড়ে, শয়তানের বাচ্চা-- ডাক তোর মা'কে।

ডম্বরু চীৎকার করে চন্দরার নাম ধরে। আর জঙ্গল তখন বর্শা উঁচিয়ে রেখে ডম্বরুর পিছনে গিয়ে তার দুটি হাত পিঠমোড়া করে মুচড়ে রাখে। বলে, শয়তানের বাচ্চা শয়তান—

ওদিকে নতুন করে ধনুকে তীর যোজনা করছে চন্দরা। তীর তাক করেও দাঁড়িয়ে আছে সে। এখন তীর ছুঁড়লে তা ডম্বরুর বুকে গিয়ে বিঁধবে।

ডম্বরু ঠকঠক করে কাঁপছে। জঙ্গলের ইস্পাত-হাতের বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

এবারে পিছু হেঁটে ডম্বরুকে টেনে নিয়ে চললো জঙ্গল। ডম্বরু একক্ষণে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বলছে, জানিস আমি কে? ডাকিনী মন্তর পড়ে এখনি তোকে ভেড়া বানিয়ে ছাড়বো। আমারে তুই চিনিস নাই—মা তারা।

—তোর জিব ছিঁড়ে ফ্যালবো ও মুখে মায়ের নাম করলে। বলে হাঁটু দিয়ে ডম্বরুর কোমরে সজোরে আঘাত করলো জঙ্গল। 'কোঁক' করে একটা আওয়াজ করলো ডম্বরু।

একটা গাছের কাছে ডম্বরুকে টেনে নিয়ে এলো জঙ্গল। গাছের গুঁড়িটাকে পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে ডম্বরুর গায়ের নামাবলি দিয়ে দুটি হাত সজোরে বাঁধলো। পাশেই একটা লতা ঝোপ ছিল—তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে আনলো অনেক লতা। লতার বাঁধনে ডম্বরুর সর্বাঙ্গ গাছের সঙ্গে জড়িয়ে দিলে জঙ্গল। তারপর তার তলপেটে সজোরে লাথি মেরে বললে, কি হে কুত্তার বাচ্চা—ডাক তোর ভূত-পেত্নী-ডাইনীদের।

জঙ্গলের দু-চোখে আগুন, আগুন তার মনে। আবার সে ছুটে যায় আহত শূয়োরটার দিকে। শূয়োরটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি। বর্শাটা হ্যাচকা টান দিয়ে বার করে নেয়। নাড় ভুঁড়ির খানিকটা বেরিয়ে আসে বর্শা ফলকের সঙ্গে। রক্ত মাখা বর্শা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মাটিতে নামিয়ে রাখে তীর ধনুক। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় চন্দরার দিকে। বলে, চন্দরা —আমাকে মার এবার, এই তো আমি বুক পেতে দেলাম তোর সামনে।

জঙ্গল স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দরাও কেমন যেন স্থির হয়ে গেছে।

ওদিক থেকে ডম্বরুর গলা শোনা যায় চন্দরা, শয়তানকে মার।

চন্দরা তবুও দাঁড়িয়ে।

ডম্বরু এবারে চীৎকার করে বলে, না মারিস তো—তোকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

যদিও চন্দরার হাত কাঁপছে, তবু সে ধনুকে তীর যোজনা করে। জঙ্গল বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। আর চন্দরা তার ধনুকে তীর যোজনা করেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

আচমকা নানাকণ্ঠের কলরব ভেসে আসে। বর্শা উঁচিয়ে নিয়ে নালা পেরিয়ে ছুটে আসে অর্জুন পিছন দিক থেকে। ছুটে আসছে কাজলি, পিংলা, রঘু, মিন্দা, আকাশী ছাড়া আরো অনেকে।

চন্দরার আহত পৌরুষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার তীর ছুটে আসে। বিঁধে যায় জঙ্গলের ডান হাতে কব্জির ওপরে।

যন্ত্রণায় এতটুকু শব্দ করলো না জঙ্গল। তীরটা খুলে ফেললো। ক্ষতস্থান দিয়ে উষ্ণ রক্ত ছুটে বেরোলো।

ততক্ষণে চন্দরাকে পাকড়াও করেছে অর্জুনের দল। কাজলি ছুটে এসেছে নালা পেরিয়ে। জঙ্গলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। জঙ্গল বলছে, ভয় নেইরে কাজলি, একটু রক্ত ঝরছে এখনি বন্ধ হয়ে যাবে।

ওদিকে বুনো শূয়োরটা শেষবারের মতো কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।

চন্দরাকে ধরে অর্জুন নিয়ে এলো জঙ্গলের কাছে। জঙ্গল একবার তাকালো চন্দরার মুখের দিকে। আর ঠিক সেই সময়ে পিংলা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো মাটিতে। কিছু বলতে গেল জঙ্গলের মুখের দিকে চেয়ে। পারলো না। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

—ওকে তুমি ছেড়ে দাও অর্জুন। বলে জঙ্গল ছুটে এসে কোলে তুলে নিলে পিংলার মাথা।

পিংলার ঠোঁট কাঁপছে থর থর করে। আধা-অচেতন অবস্থায় শুধু চোখ মেলে দেখছে জঙ্গলকে ।

অর্জুন নালা থেকে গায়ের গেঞ্জি ভিজিয়ে জল নিয়ে এলো। চোখে-মুখে জল দিতে ঘোরটা কেটে গেল পিংলার। জঙ্গলের একটি হাত বুকের ওপর টেনে নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললে, ফোঁটা নিবি তো দাদা?

জঙ্গলের দু চোখ জলে ভরে এলো।

পিংলা বলে, তোর রক্তের টিপ আমারে পরায়ে দে দাদা।

— ছেলেমানুষী করে না পিংলা। ও কথা আর বলিস নে। জঙ্গল উঠে চন্দরার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

মাথা নীচু করে চন্দরা।

জঙ্গল বলে, কি র‍্যা— বুক পেতে দেলাম, আমাকে মারতে পারলি নে?

বলেই চন্দরাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কেঁদে ওঠে জঙ্গল।

—তুই তো কাঁদছিস, চন্দরা বলে, আমি কাঁদতে পারছি না কেনে! আমার যে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

জঙ্গলের হাতের ক্ষতস্থান থেকে দরদর ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছে। অথচ যন্ত্রণায় এতটুকু কাতর নয় সে।

রঘু নিয়ে এলো বিশল্যকরণীর পাতা। দাঁতে চিবিয়ে রস বার করে জঙ্গলের ক্ষতস্থানে দিলে। কাজলি তার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিলে ক্ষতস্থান।

ডম্বরুর কাছে গেল জঙ্গল। আর সবাই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। জঙ্গল দেখছে শয়তান ডম্বরুকে।

ডম্বরু পাথর হয়ে গেছে। তার মুখের রঙ বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। তার সে চোখের আগুন নিবে গেছে।

জঙ্গলের উত্তেজনাও কমে এসেছে। এখন সে শান্ত, স্থির। অর্জুনকে ডেকে বলে, ওর বাঁধন খুলে দে অর্জুন। ওকে ছেড়ে দে।

—না। ছাড়বো নাই। ওকে আমরা দেখ্যে নিব। অর্জুন সোজা সজোরে চড় মারে ডম্বরুর গালে।

অর্জুনের চড় নীরবে হজম করে ডম্বরু।

জঙ্গল বলে, ওর বাঁধন খুলে দে। ওকে নিয়ে চল বাশুলীর ঠাই।

অর্জুন বলে, শয়তানটাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো! ওর শয়তানী আজ চোখে দেখ্যাছি। ওতো সব পারে।

একটা চাপা হাঁচির শব্দ হলো পাশের ঝোপে। রঘু ছুটে গেল ঝোপের দিকে।

শিয়ালমুখো মার্কণ্ড ওঝা ঝোপের মধ্যে বসে আছে।

—এ্যাই কুত্তার বাচ্চা বেরিয়ে আয়? রঘু বলে।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে মার্কণ্ড। তখন তার একেবারে বেসামাল অবস্থা। কাপড়চোপড় ভিজে গেছে।

অবস্থা দেখেই সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। অর্জুন এগিয়ে যায়, সজোরে একটা লাথি মারে মার্কণ্ডকে। ছিটকে পড়ে শিয়ালমুখো মার্কণ্ড।

এবারে ডম্বরুর বাঁধন খুলে দিলে অর্জুন। বললে, চল বেটা—আজ তোকে হাঁড়িকাঠে খতম করবো।

ডম্বরু নীরব।

শিয়ালমুখো মার্কণ্ড ততক্ষণে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে। দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটুতে চোট লেগেছে।

—ওঠ হারামজাদা।

উঠে দাঁড়াতে ককিয়ে ওঠে মার্কণ্ড।

—নে, চল। অর্জুন বলে।

সবাই এগিয়ে চলে। ডম্বরুর পাশে পাশে খেঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে মার্কণ্ড।

—চন্দরা কুথায় গেল? পিংলা বললে, সে আসে নাই?

জঙ্গল ফিরে তাকালো পিছনে। চন্দরা দাঁড়িয়ে আছে।

—এই চন্দরা, আয়। জঙ্গল ডাকলো।

—আমি যাবো না র‍্যা। চন্দরা বলে, তোরা যা।

জঙ্গল নিজে থেকেই চন্দরার কাছে যায়। যদিও তার একহাত আহত, তবু দুহাতে জড়িয়ে ধরে চন্দরাকে।

চন্দরা ভেঙে পড়ে অশান্ত কান্নায়।

সন্ধ্যার মুখোমুখি ডম্বরু আর মার্কণ্ড ওঝাকে নিয়ে সবাই এসে পৌঁছলো বাশুলীর ঠাঁই।

বাশুলীর ঠাঁই-এ তখন অনেক মানুষের ভিড়।

কিন্তু দেখেশুনে সবাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যায়। সবার মুখে-চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া নামে।

জঙ্গল আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় বেদীর কাছে। ফিরে তাকায় কালীমায়ের মূর্তির দিকে। অর্জুনেরা পাকড়াও করে ডম্বরু আর মার্কণ্ডকে, ধাক্কা দিয়ে বেদীর নীচে বসিয়ে দেয়।

হিন্দোল এগিয়ে আসে। কিন্তু আর আর জমা হওয়া মানুষেরা চুপচাপ। কেমন যেন শ্মশানের নীরবতা এখানে।

॥ পনেরো ॥

সেই রাতেই গিধনি থেকে দাশু করকে নিয়ে এলো অর্জুন। যদিও পাশ করা ডাক্তার নয়—তবু হাতযশ আছে দাশু করের। এ অঞ্চলের লোক বলে, যেখানে দাশু কর যম সেখানে দাঁড়ায় না।

একটা ঘোড়া আছে দাশু করের। দূরের পথ হলে ঘোড়ায় চেপে যান। গিধনি থেকে চিলকিগড়ের পাহাড়ী গাঁ—ঘোড়ায় চেপেই এসেছিলেন দাশু কর। জঙ্গলকে দেখে যা করার করে আবার ফিরে গেছেন রাতে। ওষুধ-পত্তর যা দেবার দিয়ে গেছেন ডাক্তার। একটা ইনজেকশন দিয়ে বলেও গেছেন আরো ক'একটা ইনজেকশন দেওয়ার দরকার।

এত সময় যন্ত্রণা বোধ করেনি জঙ্গল। কিন্তু এবারে যেন যন্ত্রণার সরীসৃপটা তার শরীর জুড়ে হেঁটে বেড়াতে লাগলো। সে যন্ত্রণা এ ক্ষতের জন্য নয়, সে সে যন্ত্রণা মনের। যে মন এখন উধাও হয়ে যেতে চাইছে নদীনালা আর বাদাবনের দেশে।

ঘরের দাওয়ায় দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে জঙ্গল। তাকে ঘিরে পিংলা অর্জুন, কাজলি, রঘু ছাড়াও পাহাড়ী গাঁয়ের অনেকেই। ভিড়ের মধ্যে একটি মুখকে খুঁজতে চাইছে জঙ্গল। সে মুখ চন্দরার।

পিংলা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে জঙ্গলের মাথায়। এই একটি মেয়ে, তার সঙ্গে ছায়ার মতো রয়েছে। ওকে ছেড়ে যেতে জঙ্গলের সত্যিই কষ্ট হবে। আর হয়তো পিংলা কষ্ট পাবে তার এই ভিনদেশী দাদার জন্যে।

—চন্দরা কোথায় পিংলা ?

—জানি না।

—দ্যাখ না, সে কোথায়! তাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে।

—আমি পারবো না।

—কেন ?

—তুই জানিস না কেনে ?

—ওর ওপর রাগ করিস নে পিংলা। দেখিস ও এবারে কতো বদলে যাবে। যা পিংলা ডেকে নিয়ে আয় চন্দরাকে।

—আমি পারবো না।

জঙ্গল টেনে নেয় পিংলার একটি হাত। পিংলা বলে, তোর মনটা বড়—তুই পারিস ওকে ভালবাসতে। আমি পারবো নাই।

—ওটা তোর মুখের কথা—মনের কথা নয়। বলে পিংলার হাতখানা বুকের মধ্যে নিয়ে দুচোখ বন্ধ করে জঙ্গল।

ঘুমিয়ে পড়ে জঙ্গল। যারা দাঁড়িয়েছিল এক এক করে চলে যায়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে জঙ্গল। সে ফিরে গেছে মায়ের কাছে। আর গভীর ঘুমের মধ্যেও সে বলে ওঠে, মা আমি এইচি মা। মা - মাগো—

আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে জঙ্গল।

পিংলা তখনো জেগে বসে অছে। তার মনের মধ্যে এখনো একটা চাপা ভয় জড়িয়ে রয়েছে।

শেষ রাতে জঙ্গলের পাশেই শুয়ে পড়ে পিংলা। ঘুমিয়েও পডলো।

রাত ভোর হলো।

ঘুম ভেঙেছে জঙ্গলের। পাশ ফিরে তাকালো। পিংলা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। হয়তো সারারাত ও ঘুমোয়নি!

উঠে বসল জঙ্গল। হাতে ব্যাথার টাটানি। কিন্তু মনটা দারুণ হালকা। পেঁজা তুলোর মতন।

একটি সুন্দর সকাল। এমন সুন্দর সকাল জঙ্গলের জীবনে আসেনি। একটা চিন্তা আসে তার মনে—দুরন্ত অভিশাপের ভয়ংকর বোঝাটা নেমে গেছে। ঈশ্বর পাহাড়ী মরেছিল, মরেছিল দুর্জয় পাহাড়ী, কিন্তু সে মরেনি। বেঁচে আছে।

চোখে জল আসে জঙ্গলের। ঈশ্বরকে দেখেনি, কিন্তু তার ছবি দেখেছে। বাবাকে মনে পড়ে না। তবু মনে মনে বাবার একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই সে ছবিটা স্পষ্ট হয় না। স্পষ্ট হওয়ার আগেই হারিয়ে যায়।

বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ে জঙ্গলের চোখ দিয়ে। ভারশূন্য মনে সে চুপচাপ বসে থাকে। দৃষ্টিটা তার শিশির ভেজা শাল মহুয়ার বনের ওপারে। যেখানে সূর্য উঠবে।

—জঙ্গল।

ডাক শুনেই ফিরে তাকাল জঙ্গল।

ওসমান চাচা এসে দাঁড়িয়েছে উঠোনে।

—চাচা, তুমি!

—হ্যাঁ। ওসমানের কণ্ঠে শাসনের স্বর।—তোর কি আক্কেল জ্ঞান বলে কিছু নেই! কদিন এইছিস তার খবর আছে? ভাবী যে কেন্দে কেটে বিছানা নেছে। একটা খবরও তো দিতে পারতিস।

—এসো চাচা এসো। বলে পিংলাকে ডাক দেয় জঙ্গল।

পিংলা ধড়মড় করে উঠে বসে। ঘুম চোখ মুছতে মুছতে বলে, কি দাদা--ডাকো কেনে?

—আমার চাচা এসেছে। ওসমান চাচা।

পিংলা তাকায় উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার দিকে।

দড়ির খাটিয়া পাতা ছিল উঠোনে, ওসমান সেখানেই বসে পড়ে। পিংলার পিঠে হাত রেখে জঙ্গল বলে, আমার বোন পিংলা।

ওসমান এতো সময় লক্ষ্য করেনি জঙ্গলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত। গায়ে একটা চাদর জড়ানো ছিল বলেই তার চোখে পড়েনি। চাদরটা সরে যেতেই ওসমান বলে, ওকি রে—তোর হাতে কি হয়েছে?

—কিছু না চাচা। জঙ্গল বলে, সেই পুরনো অভিশাপটা ছেড়ে গেল তো—তাই একটু দাগ দিয়ে গেল। বুঝেছো।

—কিন্তু কি হয়েছে বলবি তো?

—বলবো চাচা, তোমারে সব বলবো। এখন বোস তো থির হয়ে। জঙ্গল নেমে আসে উঠোনে। বলে, দুষ্টু ছেলের অনেক খর—এ এমন কিছু না চাচা।

—তোরে আমি আজও বুঝতি পারলাম না। ওসমান আশপাশের পরিবেশে চোখ বুলিয়ে নেয়। বলে, দেশটা কিন্তু বেশ জঙ্গল। চোখ জুড়িয়ে যায়।

ওসমান বেশ জমিয়ে নিয়েছে। হিন্দোলের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করেছে উঠোনে বসে। পিংলা এর মধ্যে মহিষের দুধ দিয়ে চা বানিয়ে দিয়ে গেছে দুবার।

অর্জুন রঘু ছাড়া আরো কয়েকজন খোঁজখবর নিতে এসেছিল জঙ্গলের। তারাও জমে গেছে ওসমানের সে গল্পের আসরে।

সুন্দরবনের নানা গল্প ফেঁদে বসেছে ওসমান। সে গল্পের সঙ্গে পাহাড়ী গাঁয়ের একজন মানুষের কথা মিশে রয়েছে। সে মানুষ হলো ঈশ্বর পাহাড়ীর বেটা দুর্জয় পাহাড়ী।

গল্পের আসর জম-জমাট। এমন সময় বাড়ির বাইরে চন্দরার জড়িত কণ্ঠ শোনা গেল। —না, আমি ঘরকে যাবো নাই। আমি মরবো, রেল লাইনে মাথা দেবো।

গগন পাহাড়ী ধরে আনছে চন্দরাকে। চন্দরার তখন রীতিমত বেসামাল অবস্থা। হাঁড়িয়ার নেশায় চুর সে। সর্বাঙ্গে ধুলোকাদা মাখা। গগন তাকে যত টানছে, সে ততো নিজেকে ছাড়াতে চাইছে। ঘরে সে আসবে না।

হিন্দোল উঠে দাঁড়ায়। বলে, উয়্যাকে যেতে দাও গগন। উয়ার মুখ আমি দেখবো নাই।

—কাকা! জঙ্গল এগিয়ে যায় চন্দরার কাছে।

হিন্দোল চীৎকার করে, আমি ওর মাথা ভাঙবো।

—আঃ কাকা। জঙ্গল ততক্ষণে চন্দরাকে ধরে ফেলেছে।

ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছে না চন্দরা। টলছে। তারই মধ্যে একবার লাল চোখ মেলে তাকালো জঙ্গলের মুখের দিকে।

জঙ্গল বলে, যা ঘরে যা। আজ ভাইফোঁটা—পিংলা তোকে ফোঁটা দেবে। নিবি না?

—দাদা।

—হ্যাঁ।

—দাদা গো। বলে চন্দরা লুটিয়ে পড়ে জঙ্গলের পায়ের ওপর। ভেঙে পড়ে অশান্ত কান্নায়।

কান্নার ছোঁয়া লাগে জঙ্গলের চোখে। তারও চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ে।

আর পিংলা তখন ঘরের দরজায় দুহাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে গুমরে গুমরে উঠছে।

জঙ্গল বলে, চন্দরা আজই আমি চলে যাবো। বাপ ঠাকুর্দার দেশ দেখতি এইছিলাম— দেখা তো হলো, এবারে চলে যাবো।

—চলে যাবি?

—হাঁরে। পিংলার ফোঁটা নেব বলেই আছি। ওসমান চাচাকে মা পাঠিয়েছে আমাকে নিতে, চাচার সঙ্গেই চলে যাবো। জানিস এদেশটা খুব

ভালো লেগেছে আমার। এবারে তোরা যাবি? ভিজে মাটির দেশটা দেখে আসবি, তারপর আবার আমি আসবো।

জঙ্গল যতো কাঁদছে, চন্দরাও ততো কাঁদছে।

এবারে জঙ্গল ডাক দেয় পিংলাকে। এই পিংলা, তোর দাদাকে ঘরে নিয়ে যা।

পিংলা আসে। চন্দরাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে।—আয় চন্দরা—

—আমারে ফোটা দিবি তো?

—দিব, দিব, জঙ্গলদাদাকে দিব, তোকে দিব। আয়—

—দাঁড়া, তুলুং-এ ডুবে পাপ ধুয়ে আসি, তারপর—

পাশাপাশি দুটি আসনে জঙ্গল আর চন্দরা বসেছে। সামনে জলছে প্রদীপ, পাথরের রেকাবিতে ক্ষীর, লাড্ডু আর মুড়কি।

ফোঁটা দিলে পিংলা। একটি কোরা ধুতি দিলে জঙ্গলকে। জঙ্গল পঁচিশটা টাকা দিলে পিংলার হাতে। বললে, তোর পছন্দে শাড়ী কিনে নিবি।

আর চন্দরা বললে, ঝাড়গাঁ থ্যাকা তোকে আমি লাল ডুরে শাড়ী কিন্যা দিব।

জঙ্গলের দেওয়া টাকা পিংলা কপালে ঠেকিয়ে আঁচলে বাঁধলো। বললে, সত্যিই তুই চল্যা যাবি দাদা। আবার আসবি তো?

জঙ্গল চুপ করে রইলো।

পিংলার কণ্ঠে একই জিজ্ঞাসা বললে, আবার আসবি তো?

জঙ্গল এবারে মৃদু হেসে বললে, আবার তোর বিয়ের সময় আসবো পিংলা।

লজ্জায় নত হলো পিংলার মুখ।

জঙ্গল স্পর্শ করলো পিংলার চিবুক। বললে, তুই আমার ছোট বোন-- তোর বিয়ের সময় আমার মাকে নিয়ে আসবো। কেমন?

পিংলা মুখ তোলে। তার দুচোখে তখন জল টলমল করছে।

জঙ্গল বলে, আজ কাঁদতে নেই রে। শুভদিনে কেউ কাঁদে—বোকা মেয়ে! কই দেখি, হাসতে পারিস কিনা! হাসলে তোকে ভারি সুন্দর দেখায়।

কান্নার মধ্যেও পিংলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। হাসি কান্নার রঙ একাকার হয়ে মিশে যায় পিংলার মুখে।

ঈশ্বর পাহাড়ীর নাতি চলে যাবে—খবরটা পাহাড়ী পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে অনেকে এসেছে হিন্দোল পাহাড়ীর বাড়ী।

সবারই মন ব্যথায় কাতর। সবাই বলতে চায়—তুই এদেশে থাক জঙ্গল।

কিন্তু জঙ্গল কোনো কথাই বলেনি। সে শুধু সকলের মুখের দিকে চেয়ে হেসেছে।

গোছগাছ সারা হয়ে গেছে জঙ্গলের। পিংলার দেওয়া নতুন কাপড় পরেছে, পরেছে সার্টিনের পাঞ্জাবী। মাথার বাবরি চুল টেরি কেটে আঁচড়ে দিয়েছে পিংলা।

আর সময় নেই। জঙ্গল গুরুজনদের পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। ছোটদের হাত ধরে স্নেহ জানালো। অর্জুন আর পিংলাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখলো। তারপরই পিংলা লজ্জা পেয়ে ছুটে পালালো ঘরের মধ্যে।

ঘরে এলো জঙ্গল। পিংলা কাঁদছে।

পিংলার চিবুক ছুঁয়ে জঙ্গল বললে, কাঁদতে নেইরে। আবার আমি আসবো, তোর জন্যেই আসবো, এখন আমি যাই।

বাইরে এলো জঙ্গল। হিন্দোলের উঠোন ভর্তি মেয়ে পুরুষ। কিন্তু যে মুখ দেখতে চায় জঙ্গল, সে তো এখানে নেই। কাজলি তো এসেছিল, কোথায় গেল!

এবারে ওসমান চাচার সঙ্গে পা বাড়ালো জঙ্গল। ঠিক যাবার মুখেই এক হাঁড়ি ছোলার মণ্ডা দিলে কাকিমা।

চন্দরা কোথায় ছিল, ছুটে এসে ওসমানের হাত থেকে টিনের স্যুটকেশ, জঙ্গলের হাত থেকে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে নিলে। বললে, চল্ দাদা, আমি যাবো ইষ্টিশানে।

শুধু চন্দরা নয়, অর্জুন, রঘু, আকাশীও চললো সঙ্গে সঙ্গে। পথে পা দিয়ে একবার পিছন দিকে তাকালো জঙ্গল। বাড়ীর উঠোনে জড়ো হওয়া মানুষগুলো তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

জঙ্গলের বুকটা ভরে উঠলো। এখানে এসে সে পেয়েছে অনেক ভালোবাসা, যা সে কখনো ভুলবে না।

যে পথ ধরে এসেছিল জঙ্গল, সেই পথ ধরে ফিরে চললো।

গাড়ী ছাড়ার মুখেই জঙ্গল শুনতে পেল পিংলার কণ্ঠস্বর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো জঙ্গল। শুধু পিংলা নয়, কাজলিও এসেছে। দুজনের হাতে নানা রঙের বনের ফুল

—ফুল নিবি না দাদা?

ট্রেন তখন আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করেছে। হাত বাড়ায় জঙ্গল। দুহাত ভরে নেয় পিংলা আর কাজলির দেয়া ফুল। ফুল দেবার মুহূর্তে কাজলি কি বলতে চেয়েছিল সেই জানে, তবে জঙ্গল বলতে চেয়েছিল—কাজলি সত্যিই তুই সুন্দরী।

চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে জঙ্গল। সবাইকে দেখতে পাচ্ছে সে।

কিন্তু সকলের মধ্যেও কালো মেয়ে কাজলির মুখটা যেন স্পষ্ট।